ডোডো-তাতাইয়ের জন্যে

তারাপদ রায়

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া ১৩৭০

প্রকাশক
শীলা ভট্টাচার্য
আশা প্রকাশনী
৭৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রক
রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ টাইমস্ প্রিন্টার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ :
কৃত্তিবাস রায়

উৎসর্গ

ভিটু, বুন ও বুবুকে

ডোডো-তাতাইকে নিয়ে লিখতে লিখতে তারা কবে একদিন বড় হয়ে গেছে। এখন শুধু তাদের নিয়ে নয়, তাদের জন্যেও গল্প চাই। খুঁজেপেতে নতুন পুরনো চৌদ্দটি গল্প মিলিয়ে তাই এই বই, ডোডো-তাতাই এবং তাদের সমবয়সী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার জন্যে।

তারাপদ রায়

সূচিপত্র
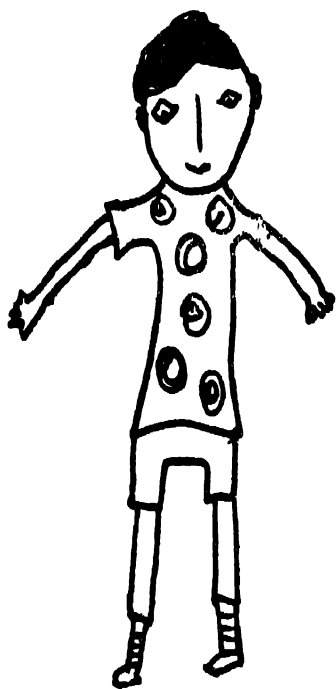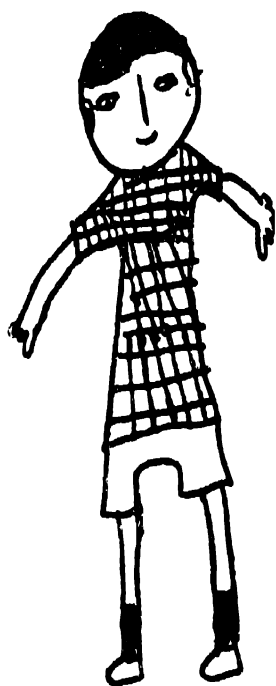
বড় হওয়ার গল্প
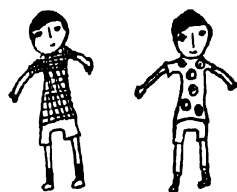
একেকদিন মাঝরাত্তিরে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সাদা হুলো নেমে আসে। এসে একতলায় সিঁড়ির এক নম্বর ধাপে বসে রাগে লেজ আছড়ায় আর গর্‌গর্‌ করতে থাকে, 'কই তাতাইয়ের আদরের বিড়াল কৃষ্ণকান্ত কোথা? রাত-দিন আহ্লাদে মিউমিউ করে বেড়াচ্ছো, এসো একবার ঘাড়টা মটকিয়ে দিয়ে যাই।'

সাদাহুলোকে দেখা মাত্র ভয়ে শিউরে ওঠে কৃষ্ণকান্ত। কৃষ্ণকান্ত তো সামান্য একটা বিড়ালছানা, বড় বড় কুকুর থেকে মানুষেরা পর্যন্ত সাদাহুলোকে ভয় পায়। ভয় পাওয়ারই কথা, যেমন গোল্লা গোল্লা চোখ, বিরাট কাতলা মাছের মত মাথা তাতে আবার একটা কান কাটা, লেজেও লোম নেই—ছেঁড়া-ছেঁড়া। অনেক মারামারি গুণ্ডামি করে সাদা-হুলোর চেহারা এরকম হয়েছে। সিঁড়ির নিচে কিংবা রান্না-ঘরের ছাদে বসে সাদাহুলো যখন লেজ আছড়িয়ে অন্যদের লড়াই করতে ডাকে তখন দুধের শিশু কৃষ্ণকান্ত কেন, আশে-পাশের কোন বিড়ালই তার সামনে যেতে সাহস পায় না।

সাদাহুলো কিন্তু কোনদিনই বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি

কৃষ্ণকান্তকে। সাদাহুলোর শব্দ পেলেই অথবা তাকে দেখলেই কৃষ্ণকান্ত এক লাফে ঘরে ঢুকে বিছানায় উঠে পড়ে ঘুমোনো তাতাইয়ের কোলে গিয়ে মুখ লুকোয়। সঙ্গে সঙ্গে তাতাই উঠে পড়ে, ডাকে 'বাবা, মা, কাকা।' তখন তাতাইয়ের বাবা ওঠে, তাতাইয়ের মা ওঠে, তাতাইয়ের কাকা ওঠে। তাতাইয়ের কাকা লাঠি হাতে ওঠে, তার বালিশের নিচে লাঠি থাকে সাদাহুলোকে মারবার জন্যে। সবাই মিলে তাড়া করে যায়, সাদাহুলো দৌড়িয়ে সিঁড়ি থেকে দেয়ালে উঠে যায়, তারপর তর্‌তর্‌ করে পালিয়ে যায়। তখন তাতাইয়ের বাবা বলে, 'কটা বাজে?' তাতাইয়ের কাকা বলে, 'সাড়ে বারোটা।' তাতাইয়ের মা স্টোভ ধরায়, চা তৈরী করে। তাতাইয়ের বাবা বিনা দুধে চা খায়, তাতাইয়ের কাকা কম দুধে চা খায়, তাতাইয়ের মা ঠিক দুধে চা খায়, তাতাই বেশি দুধে চা খায়, কৃষ্ণকান্ত শুধু দুধ খায়।

সবাই আবার শুয়ে পড়ে, ঘুমিয়ে পড়ে।

পরের দিন অথবা তার পরের দিন আবার রাত্তিরবেলা সাদাহুলো আসে। আবার সবাই ওঠে, চা খায়, ঘুমোয়। শুধু তাতাই মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখে একটা বড় সাদা বাঘ, তার লেজের লোম ওঠা, তার কান কাটা, সে তাতাইকে মুখে করে আর কৃষ্ণকান্তকে থাবায় তুলে যেন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে।

সরস্বতী পুজোর দিন তাতাইরা সবাই মিলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিল, ফিরতে ফিরতে গভীর রাত। ফিরে দেখে কৃষ্ণকান্ত কোথাও নেই, এ ঘর সে ঘর বারান্দা—কোথাও কৃষ্ণকান্ত নেই। অবশেষে কৃষ্ণকান্তকে পাওয়া গেল উঠোনের কয়লার গাদার পাশে, ঠোঁটের কোণায় ফেনা, নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। একেবারে অবশ হয়ে পড়ে আছে, বাঁচবে কি

বাঁচবে না কে জানে। সবাই বুঝলো এ সেই সাদাহুলোর কাণ্ড। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরে তাতাইয়ের বাবা বলে, 'কটা বাজে?' তাতাইয়ের কাকা বলে, 'সাড়ে বারোটা।' সেদিন আর চা খাওয়া হয় না। সবাই চুপচাপ যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। সবাই মিলে একটা কানকাটা, লেজের লোম-ওঠা পাজি সাদা বাঘের দুঃস্বপ্ন দেখে।

বিড়ালের নাকি এক জন্মে সাতটা জীবন। কৃষ্ণকান্তের-ও তাই, তাই কৃষ্ণকান্তও মরলো না। আস্তে আস্তে একা একাই ভালো হয়ে উঠলো। আবার ঘুরঘুর করে ঘরে-বারান্দায় ঘুরতে লাগলো, দুধ মাছের কাঁটা খেতে শুরু করলো, আহ্লাদে লেজের রোঁয়া ফুলিয়ে তাতাইয়ের পায়ে পিঠ ঘষতে লাগলো, জানলায় বসে রাস্তার কুকুর, তাতাইয়ের স্কুলের বাসের যাতায়াত, লোকজন দেখতে লাগলো।

এর পর অনেকদিন সাদাহুলো আসেনি। সাদাহুলো হয়তো ভেবেছিলো, কৃষ্ণকান্ত মরেই গেছে, কত বিড়ালই তো সে মেরেছে, এ আর নতুন কি?

কিন্তু আবার একদিন মাঝরাত্তিরে সিঁড়ির উপরে সাদাহুলোর গর্‌গরানি শোনা গেলো। তাতাই চমকে উঠে বসলো বিছানায়,- 'বাবা, মা, কাকা।' তাতাইয়ের বাবা উঠলো, তাতাইয়ের মা উঠলো, তাতাইয়ের কাকা লাঠি হাতে উঠলো।

কিন্তু কৃষ্ণকান্ত কোথায়? এতক্ষণ বোধহয় সাদাহুলো তাকে আবার মেরেই ফেলেছে। সবাই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ির নিচে আলো জ্বালালো। সামনেই কৃষ্ণকান্ত দাঁড়িয়ে, চোখ জ্বলজ্বল করছে আগুনের বলের মত, রাগে ফোলা লেজটা আছড়াচ্ছে বারান্দায়, গোঁ গোঁ করছে, কান

দুটো গুটিয়ে নামিয়ে এনেছে। আর, আজ আর সিঁড়ির সব চেয়ে নিচের ধাপে নয়, সাদাছুলোটা নিরাপদ ব্যবধানে সিঁড়ির সব চেয়ে ওপরে বোকার মত স্তম্ভিত হয়ে কৃষ্ণকান্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সবাইকে দেখে সাদাছুলো দৌড়ে পালালো।

তাতাইয়ের বাবা একবার কৃষ্ণকান্তের দিয়ে তাকালো, তারপর বললো, 'কটা বাজে?' তাতাইয়ের কাকা বললো, 'সাড়ে বারোটা।' তাতাইয়ের মা স্টোভ ধরালো, চা তৈরী করলো। বাবা বিনা দুধে, কাকা কম দুধে, মা ঠিক দুধে চা খেলো, তাতাই বেশি দুধে চা খেলো। কৃষ্ণকান্তের দুধ বাটিতে পড়ে রইলো, কৃষ্ণকান্ত দুধ খেলো না। সে তখনো বারান্দায় রাগে লেজ আছড়াচ্ছে আর গোঁ গোঁ করছে।

নিউ তরফদার স্যু হাউস
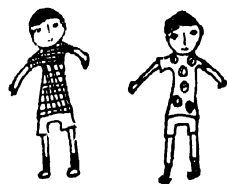
কৃষ্ণগঞ্জ শহরের আদিবাসিন্দা যাঁরা বেঁচে আছেন, যাঁরা পুরনো দিনের লোক, তাঁরা হয়তো নিউ তরফদার স্যু হাউসের কথা এখনো মনে করতে পারবেন। আমরা চার পুরুষ ধরে ঐ দোকানের জুতো পায়ে দিয়ে এসেছি। উনিশ-শো এগারো বারো সালে 'দি নিউ তরফদার স্যু হাউসের' মালিকানা নিয়ে কি গোলমাল লাগে। ঐ গোলমালে সে সময় জুতোর দোকানটি বছর দেড়েক বন্ধ ছিলো। আমার বাবার এক জ্যাঠামশায় 'দি নিউ তরফদার স্যু হাউসের' জুতো ছাড়া পায়ে দিতেন না; ফলে ঐ সময়ে দোকান ঝাঁপ বন্ধ থাকায় তাঁকে বেশ কিছুদিন খালি পায়ে থাকতে হয়।

আমার বাবার ঐ জ্যাঠামশায় এমনিই একটু গোলমেলে স্বভাবের ছিলেন। তাঁর কোনো কিছুই ঠিক নিয়মে চলতো না। আমাদের ছোট বয়সে দেখেছি তাঁর শখ হয়েছিলো অয়েল পেন্টিং করানোর। গরীব মানুষ, তাঁর শেষ আটচালা শয়ন ঘরটি বেচে দিয়ে নিজের অয়েল পেন্টিং করানোর জন্য আর্টিস্ট নিয়ে গেলেন কলকাতা থেকে। কিন্তু ছবি আঁকতে গিয়ে সেই আর্টিস্ট একদিন ভীষণ প্রহৃত হলেন তাঁর হাতে।

মূল গোলমাল বেধেছিলো এই নিয়ে যে ছবিতে নাকের ডগা থেকে কানের ফুটো পর্যন্ত গালের যে দূরত্ব আর্টিস্ট দেখানো প্রয়োজন বোধ করেছিলেন আমার বাবার জ্যাঠামশায় সেটা মোটেই পছন্দ করেন নি। প্রায় এই রকম সব কারণে পরপর তিনজন আর্টিস্ট মার খেলেন তাঁর হাতে।

এই রকম পূজনীয় পিতামহ মহাশয়ের কাহিনী যথাস্থানে এবং যথাকালে বলা যাবে। ইতিমধ্যে আরেকবার 'দি নিউ তরফদার সু হাউসে' ফেরা যেতে পারে।

'দি নিউ তরফদার সু হাউসের' মালিক গঙ্গাগোবিন্দ তরফদার একটু কড়া প্রকৃতির কৃপণ ছিলেন। ধার-দেনায় জিনিস বিক্রি করা তাঁর চরিত্রে কোথাও ছিলো না।

সেই গঙ্গাগোবিন্দবাবুর দোকানে একবার এক নতুন সেলস্‌ম্যান এলো। অল্পবয়সী চালাক চতুর ছোকরা; গঙ্গা-গোবিন্দবাবু প্রথম দিনই তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'দ্যাখো হে, কাউকে যেন ধারটার দিয়ো না।'

ছেলেটি হাত কচলিয়ে বললো, 'সে স্যার আপনাকে ভাবতে হবে না।'

সত্যিই ভাবতে হলো না। প্রথম দিনই নতুন সেলস্‌ম্যানটি তিন জোড়া জুতো ধারে বেচে দিলো। গঙ্গাগোবিন্দবাবু দুপুরে বাসায় খেতে যেতেন, সেই সময় ছেলেটি একাই ছিলো দোকানে। দোকানে ফিরে এসে তহবিল মেলাতে গিয়ে গঙ্গাবাবুর মাথায় বজ্রপাত হলো। এ কি সর্বনাশ!

তিনজোড়া জুতো ধারে বিক্রি। একজোড়া কালো অক্‌সফোর্ড সু, দাম আট টাকা, তার মধ্যে জমা পাঁচ টাকা আর তিন টাকা বাকি। আরেক জোড়া লাল বিদ্যাসাগর চটি, দাম তিন টাকা, তার এক টাকা মাত্র জমা, দু টাকাই বাকি। আর একটা চপ্পল তার দামও অর্ধেকের কম জমা পড়েছে।

হায়, হায় করতে লাগলেন গঙ্গাগোবিন্দবাবু। ক্ষেপে গেলেন একেবারে, নতুন সেল্‌সম্যানের জামার কলার চেপে ধরে চেঁচাতে লাগলেন, 'কাদের ধার দিয়েছো আমার এতসব জুতো? তারা কারা?'

অম্লানবদনে নবীন সেলস্‌ম্যান নিবেদন করলো, 'কি জানি, তাদের তো চিনি না স্যার।'

'তা হলে' গর্জন করে উঠলেন, 'এইসব বাকির টাকা আদায় হবে কোন্ চুলো থেকে?'

ছেলেটি গঙ্গাগোবিন্দবাবুর বজ্রমুষ্টি থেকে জামার কলার ছাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে বললো, 'সে আপনি ভাববেন না স্যার। তারা নিজেরাই এসে দিয়ে যাবে।'

ছেলেটির এই সারল্যে গঙ্গাগোবিন্দ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন ছেলেটিকে, 'হ্যাঁ, তারা সব তোমার মত সাধুপুরুষ!'

এর মধ্যে দোকানে কে একজন ঢুকলো, ছেলেটি কাতর হয়ে গঙ্গাগোবিন্দকে বললো, 'স্যার সেই যাদের ধার দিয়েছি, তাদের একজন এলো, ছাড়ুন তো দেখি।'

সত্যি সত্যি একজন ফিরে এসেছে দেখে গঙ্গাগোবিন্দ অবাক হলেন, কানে কানে জিজ্ঞাসা করলেন সেলস্‌ম্যানকে 'কি ব্যাপার?'

সেলসম্যান বললো, 'ওদের না ফিরে উপায় নেই স্যার।'

গঙ্গাগোবিন্দ বললেন, 'কেন?'

'কেন আর কি?' সেলসম্যান বললো, 'সবাইকে প্রতি জুতোর জোড়ায় দু পাটি করেই বাঁ পায়ের জুতো দিয়েছি। কি করে পায়ে দেবে? ডান পায়ের পাটির জন্যে ফিরে আসতেই হবে।'

'দি নিউ তরফদার সু-হাউসের' দরজার পাশে একটা ফটো

কাঁচ লাগানো শো-কেস ছিলো। সেই শো-কেসে কয়েকজোড়া নতুন জুতোর মধ্যে এক পাটি দোমড়ানো, শতছিন্ন অতীব পুরনো জুতো ছিলো। সিঁদুর এবং চন্দনের ফোঁটা লাগানো ছিলো সেই জুতোয়। মাঝে মধ্যে টাটকা বা শুকনো জবাফুলের মালাও সেই জুতোর ওপরে অতি যত্নে লাগানো থাকতো।

নতুন লোকেরা ধাঁধায় পড়তেন। এই সম্মানিত, বহুজীর্ণ জুতোটি নিশ্চয় বিক্রির জন্য নয়, কিন্তু এক পাটি কেন এবং এই জুতোটি কার?

প্রথমত, এক পাটি কেন? তার জন্যে দায়ী ঐ শো কেসের ফাটা কাঁচ। আগে দু'পাটিই ছিলো, কিন্তু যেবার প্রথম ঐ কেসের কাঁচ ভাঙে সেইবার স্যু হাউসের ভিতরের মানুষদের অসতর্কতার সুযোগে একটি পথ-চলতি নেড়ি কুকুর এক পাটি জুতো নিয়ে পালিয়ে যায়।

এই জীর্ণ জুতো জোড়া ছিলো তরফদার স্যু হাউসের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সিন্ধুগোবিন্দ তরফদারের। তাঁরই পুণ্য স্মৃতির সম্মানে জুতোজোড়া শো কেসে পুরুষানুক্রমে রক্ষিত হয়েছিলো। একদিন তারই একপাটি নিয়ে এক নেড়ি কুকুর পালিয়ে যায়।

তরফদার বংশের ইতিহাসে এরচেয়ে গুরুতর ঘটনা বোধহয় আর কখনোই ঘটে নি। তরফদার বংশ সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করেছিলেন সেই জুতোর পাটি উদ্ধার করার। হাটে-বাজারে ঢ্যাড়া পিটিয়ে দেওয়া হলো, 'দি সান সাইন প্রেস' থেকে হলুদ রঙের চৌকো কাগজে ছেপে হ্যাণ্ডবিল বিলি করা হলো:

> এক পাটি লাল রঙের ফিতাওয়ালা ডার্বি স্যু হারাইয়াছে। এখন আর লাল রং অবশ্য স্পষ্ট বোঝা যায় না, তবে মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে লাল রঙের আভাস পাওয়া যায়। জুতাটির গোড়ালির ও মুখের দিকে

চামড়া নাই এবং সুখতলা নাই, কিঞ্চিৎ বক্র জুতাটির ফিতাটি ছিন্ন ও গিঁট দেওয়া।

এই জুতাটি গত শুক্রবার সাতই ভাদ্র সন্ধ্যাবেলা একটি মাটি রঙের নেড়ি কুকুর 'দি নিউ তরফদার সু হাউসের' শো কেস হইতে মুখে করিয়া লইয়া পালাইয়া গিয়াছে।

জুতাটিকে উদ্ধার করিতে যে বা যাঁহারা সাহায্য করিবেন তাঁহাদের আগামী ˆপূজার সময় বিশেষ কমিশনে 'দি নিউ তরফদার সু হাউস' হইতে জুতা দেওয়া হইবে। জুতাটি যদি উদ্ধার করা সম্ভবপর না হয় উক্ত নেড়ি কুকুরটিকে জীবিত বা মৃত ধরিয়া দিতে পারিলেও পুরস্কার দেওয়া হইবে।"

ˆসিন্ধুগোবিন্দ তরফদারের সেই হারানো জুতোর পাটি আর ফেরত পাওয়া যায় নি। ফলে অবশিষ্ট এক পাটি জুতোই দোকানের শো কেসে দীর্ঘকাল ধরে সিঁদুর-চন্দন চর্চিত হয়ে তরফদার সু হাউসেব গৌরব বৃদ্ধি করেছে।

ˆসিন্ধুগোবিন্দ অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। আমাদের মহকুমায় তাঁরই প্রথম জুতোর দোকান। চামড়া ও জুতো নিয়ে তিনি নিজে জীবনে বহু রকম গবেষণা করে দেখেছেন।

কুকুরের চামড়া দিয়ে জুতো, বিড়ালের চামড়া দিয়ে হাতের দস্তানা, শুয়োরের চামড়া দিয়ে শক্ত সুটকেশ তৈরী করা সম্ভব কিনা এ বিষয়ে প্রায় পৌণে এক শতাব্দী কাল আগের বাংলাদেশে তিনি যথাসাধ্য গবেষণা করেছিলেন। এর এর ফল কি হয়েছিলো আজ বোঝা যাবে না, কিন্তু দীর্ঘ দশ বছর কৃষ্ণগঞ্জের রাস্তায় একটিও কুকুর বা বিড়াল ছিলো না। প্রতিটি জন্তুকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছিলো সিন্ধু-গোবিন্দের গবেষণার হাড়িকাঠে।

এই সব ছাড়াও স্বর্গীয় সিন্ধুগোবিন্দের অসামান্য অবদান দিলো একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

'জুতো ব্যবহারের সহজ প্রণালী ?'

আজ হয়তো এই বইয়ের মূল্য অনুধাবন করা সহজ হবে না, কিন্তু তখনকার সেই অজ পাড়াগাঁয়ে যখন একটিও লোক জুতো পায়ে দিতে জানতো না, সেই সময় সিন্ধুগোবিন্দের এই পুস্তিকা প্রকাশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। জুতো জনপ্রিয় করবার জন্য সিন্ধুগোবিন্দের বৃহৎ প্রয়াস এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা বহুকাল কৃষ্ণগঞ্জ নিবাসীদের বিশেষ আলোচ্য বিষয় ছিলো। জুতো কি করে পায়ে দিতে হয়, বাঁ পায়ের পাটি ডান পায়ের আগে পরাই যে স্বাস্থ্য-সম্মত, জুতো খুলে রাখার সময় যে ফিতে খুলে রাখা উচিত নয়, এই সব শিক্ষা শৈশবে আর দশজন কৃষ্ণগঞ্জবাসীর মত আমরাও ঐ পুস্তিকা থেকে পেয়েছিলাম।

জুতো বেশিদিন ঘরের কোণে বা তক্তপোষের নিচে ফেলে রাখলে যে তাতে সাপ কিম্বা বিছে বাসা করতে পারে এবং তখন কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি বিশেষ অধ্যায়ে সিন্ধুগোবিন্দ আলোচনা করেছিলেন। সিন্ধুগোবিন্দ একথা স্পষ্ট করে জুতো ব্যবহারকারীদের বুঝিয়ে ছিলেন যে জুতো ব্যবহার না করে ফেলে রাখা বিপজ্জনক, পায়ে দিতে একান্তই যদি ইচ্ছা না হয় বা অসুবিধা হয় তবে হাতে নিয়েও চলাফেরা করা ভালো এবং সম্মানজনক। হাতে জুতো নিয়ে কিভাবে চলাফেরা করা উচিত, রাস্তায় ঐ অবস্থায় পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কিভাবে নমস্কার করা উচিত, সিন্ধুগোবিন্দ চিত্রসহকারে তাঁর বইয়ে তাও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

শুধু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার জন্য বা বিলাসিতার জন্যই যে জুতো ব্যবহার নয়, জুতোর যে আরো একুশ রকম ব্যবহার

এবং তেইশ রকম উপকার আছে, স্বর্গীয় সিন্ধুগোবিন্দ তরফদার একথা বিশেষভাবে বোঝাতে মোটেই কসুর করেন নি।

যদি আপনার গেঁটেবাত থাকে তবে একাদশী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষ করে রাত্রিকালে কিছুতেই জুতো ছাড়া খালি পায়ে হাঁটবেন না! সিন্ধুগোবিন্দ তরফদার মহাশয়ের ভাষায়ঃ—

> আমাদের দেহমধ্যস্থ একপ্রকার জলগ্রন্থিতে জলের শুষ্কতা দেখা দিলে শরীর টান টান হইয়া গেঁটেবাত নামক গ্রন্থিযন্ত্রণার সঞ্চার করে। পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং একাদশী তিথিকালে সুদূর অন্তরীক্ষ হইতে চন্দ্রদেবতা নদী, নালা, খাল, পুষ্করিণী এমন কি গভীর সমুদ্র ও গঙ্গায় পর্যন্ত জল আকর্ষণ করিয়া জোয়ার-ভাঁটার আয়োজন করেন। আমাদের দেহমধ্যেও সেই জোয়ার-ভাঁটার আয়োজনে জলে টান পড়িয়া গেঁটে বাতের অসহ্য কনকনানি দেখা দিয়া থাকে।
>
> এই সময়ে অর্থাৎ এই সকল তিথিকালে 'দি নিউ তরফদার সু হাউসের' গাইড স্পেশ্যাল ব্রাউন বা ব্ল্যাক কালার (Govt. Special—Brown or Black colour) পাদুকা দিয়া পদদ্বয় ঢাকিয়া রাখিলে জোয়ার-ভাঁটার টান কিছুতেই শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থি-যন্ত্রণার সঞ্চার করিতে পারিবে না।

এর পরে বিশেষ করে রাতের বেলাতেই কেন জুতো পায়ে দেওয়া দরকার সে বিষয়ে প্রাঞ্জল আলোচনা ছিলো। পঞ্জিকা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের এমন বিচিত্র মিশ্রণ আর কোথাও সম্ভব হয়েছে বলে জানি না।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য অংশ ছিলো ঐ পুস্তিকাতে এই

গেঁটে বাত অধ্যায়েই, যেখানে তিনি গেঁটে বাত ও তরফদার স্যু হাউসের চর্মপাদুকার সঙ্গে টাইটানিক জাহাজ-ডুবির ঘটনাটিও জড়িয়েছিলেন। সেকালে টাইটানিক জাহাজ ডোবার ব্যাপারটি খুবই খ্যাতিলাভ করেছিলো। তাই হয়তো স্বর্গীয় তরফদার মহাশয় টাইটানিকের উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। কিন্তু এই বিশাল বিষয়টি জুতো ও গেঁটে বাতের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন যা তাঁর মতো প্রতিভাবান ব্যক্তির পক্ষেই হয়তো সম্ভব। দ্রষ্টব্য ঃ—

> আটলান্টিক মহাসমুদ্রে টাইটানিক জাহাজ কেন ডুবিয়াছিল, সে বিষয় সাহেব বৈজ্ঞানিকেরা অনুসন্ধান করিয়া এ বিষয়ে একমত হইয়াছেন যে জোয়ার-ভাঁটার টান-ই ইহার জন্য দায়ী। বরফের পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া ঐরূপ প্রাসাদোপম তরীর কিছু ক্ষতি হওয়াই সম্ভব নহে, আসলে জোয়ার-ভাঁটার টানেই উহা তলাইয়া গিয়াছে।
>
> লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি মহানগরের সাহেবরা বহু গবেষণা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে টাইটানিক জাহাজটি আগাগোড়া চর্মাবৃত থাকিলে এই জোয়ার-ভাঁটার টানে উহার কোনোই ক্ষতি হইত না।
>
> চর্মাবৃত থাকিলে অতবড় টাইটানিক জাহাজ রক্ষা পাইত, আপনার চরণদ্বয়ও রক্ষা পাইবে।
>
> শুধু একটিমাত্র নিবেদন, অমাবস্যা, পূর্ণিমা বা একাদশীর দিন এবং রাত্রে পাদুকা ব্যবহার করিয়াও যাঁহারা গেঁটে বাতের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবেন না তাঁহারা ইহার পর হইতে অমাবস্যা-পূর্ণিমায় জুতো পায়ে দিবার আগে দুই পায়ে উত্তমরূপে এস, জি, টি পাউডার (S. G. T. Powder) মাখিয়া লইবেন, অপ্রত্যাশিত ফল হইবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এস, জি, টি, সিন্ধুগোবিন্দ তরফদারের নামের ইংরেজি বানানের বর্ণারম্ভে তিনটি অক্ষর এবং এই পাউডার স্বর্গীয় তরফদার মহোদয়ের স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তি-প্রসূত।

নিউ তরফদার সু হাউসের জুতো অবশ্যই কিছু কিছু বিক্রি হতো, তা না হলে তিন পুরুষ ধরে দোকানটি চলা সম্ভব ছিলো না।

কিন্তু ঐ 'এস, জি, টি' অর্থাৎ 'সিন্ধুগোবিন্দ তরফদার পাউডার?'

এস, জি, টি, পাউডার। অর্থাৎ স্পেশ্যাল গাউট ট্রিটমেন্ট পাউডার, আবার অন্য অর্থে সিন্ধুগোবিন্দ তরফদার পাউডার।

স্বর্গীয় তরফদার মহোদয়ের এই অসামান্য আবিষ্কার যা পায়ে মেখে পূর্ণিমা, অমাবস্যা, একাদশীতে জুতো পায়ে দিলে গেঁটে বাত সেরে যায়, সেই পাউডারটি কিন্তু জনপ্রিয় হয়নি।

এর জন্যে পাউডারটির দোষ-গুণ, ভালোমন্দ কিছুই অবশ্য দায়ী নয়; বরং বলা যেতে পারে অন্য কয়েকটা ঘটনা পরপর ঘটে পাউডারটিকে আমাদের শহরবাসীর কাছে অপ্রিয় করে তোলে।

সিন্ধুগোবিন্দবাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন বরদা মোক্তার মশায়। ঐ বরদা মোক্তারের টাকাতেই সিন্ধুগোবিন্দবাবু একবার চামড়ার জামার ব্যবসা শুরু করেন এবং ফেল করেন। কিন্তু এতেও দুজনের বন্ধুত্বে একেবারেই কোনো চিড় ধরেনি। চিড় ধরলো একেবারে অন্য কারণে। এস, জি, টি পাউডারে শুধু গেঁটে বাতই সারে নাকি আমবাতেও সারবে, এই নিয়ে দুজনে ভীষণ মতান্তর হলো!

বরদা মোক্তার মহাশয়ের মতে এস, জি, টি পাউডারে আমবাত সারতে পারে না, কারণ তার মধ্যে যজ্ঞডুমুরের

শুকনো খোসার গুঁড়ো মেশানো নেই। কিন্তু সিন্ধুগোবিন্দবাবুর মতে তাতে কোনোই ক্ষতি হয়নি, কারণ এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ লাল আউশ ধানের চালের গুঁড়ো রয়েছে।

বরদা মোক্তার খেপে গিয়ে সারা শহরে রটিয়ে বেড়ালেন যে সাদা চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী হলেও কথা ছিল, কিন্তু এযে একেবারে লাল চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরী পাউডার। ও পায়ে মাখলে আর রক্ষে আছে। যে মাখবে তাকে গন্ধে গন্ধে সাপে-শেয়ালে কামড়াবে।

সাপে-শেয়ালে অবশ্য কামড়ালো না। কিন্তু ছোটবাজারের ফল ও মেওয়ার দোকানদার, যাকে সবাই ফলসাহেব বলতো সেই সদাহাস্যময় সিন্ধী ভদ্রলোকটিকে একটা পাগলা বিড়ালে কামড়ে দিলো। ফলের ব্যবসা চালাবার মত যেটুকু বাংলা জানা দরকার তার চেয়ে একটুও বেশি জানতো না লোকটি। ফলে বরদা মোক্তার যখন সবাইকে বলে বেড়ালেন যে, ঐ সিন্ধুগোবিন্দের এস, জি, টি, পাউডার পায়ে মেখেই ওকে বিড়ালে কামড়েছে, তখন 'দি নিউ তরফদার সু হাউসের' শত চেষ্টা সত্ত্বেও জনসাধারণ সেটা অবিশ্বাস করলো না। যেই কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করতো, 'ও ফলসাহেব, তোমাকে যেদিন বিড়ালে কামড়ালে তুমি কি সেদিন এস, জি, টি, পাউডার পায়ে মেখেছিলে?'

উত্তরে ফলসাহেব দুবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে, অর্ধেক সামনে এবং তারপর তিনপোয়া পিছনে মাথাটা দুলিয়ে মিষ্টি হেসে বলতো, 'হাঁ হাঁ।'

অচেনা ফলসাহেবের এই 'হাঁ হাঁ' এর মানে বোঝা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। কেউ যদি কখনো ফল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতো, 'ফলসাহেব, তুমি আগে ডাকাতি করতে না?' ফলসাহেব উত্তরে ঐ রকম মিষ্টি হেসে মাথা দুলিয়ে বলতো, 'হাঁ হাঁ।'

'কি ফলসাহেব আঙুরগুলো বেশ টক হবে তো?' এ প্রশ্নেরও ঐ একটি জবাব ছিলো মৃদু হাসি সহযোগে 'হাঁ, হাঁ।'

কিন্তু বরদা মোক্তারের প্রচারই জয়ী হলো। এস, জি, টি পাউডার মেখেই যে ফলসাহেব বিড়ালের কামড় খেয়েছিলেন একথা সত্যি হোক, মিথ্যে হোক শহরবাসী সবাই কিন্তু বিশ্বাস করে নিলো।

তবুও যা কিছুটা সংশয় কয়েকজন নির্বিরোধ এবং শান্ত মস্তিষ্কের লোকের মনে ছিলো সেটা সম্পূর্ণ কেটে গেলো যখন স্বয়ং সিন্ধুগোবিন্দ তরফদারকে তার নিজের দোকানের সামনে একটা টমটম গাড়ির পাজি ঘোড়ায় কামড়িয়ে দিলে।

অতি অল্পদিনের ব্যবধানে একটা ছোট নিস্তরঙ্গ শহরের জীবনে এই দুটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেলো। ফলের দোকানদার বিদেশী লোকটিকে পাগলা বিড়ালে এবং স্থানীয় জুতো-ওয়ালা সিন্ধুবাবুকে পাজি ঘোড়ায় কামড়িয়ে দিলো। এর মূলে যে সিন্ধুবাবুর আবিষ্কার ঐ এস, জি, টি পাউডার এ বিষয়ে কারোর মনে আর কোনো সন্দেহ রইলো না।

ফলে 'নিউ তরফদার স্যু হাউসের' একপ্রান্তে গাদা হয়ে পড়ে রইলো কয়েক হাজার প্যাকেট এস, জি, টি পাউডার। গেঁটে-বাত বা আমবাত কোনো কাজেই কেউ কিনলো না কখনো।

তবে শহরের গৃহিণীরা কি করে জেনেছিলেন যেন এতে আলপনা ভালো হয়। তাই ছোটরা জুতো কিনতে গেলেই তাদের মা-পিসিরা শিখিয়ে দিতো, 'এক প্যাকেট পাউডার ফ্রি চেয়ে আনিস।' সেই পাউডার দিয়ে ঝকঝকে সাদা আলপনা দেওয়া হতো পৌষ-সংক্রান্তিতে এবং উৎসবে। আর থিয়েটারের শৌখিন অভিনেতারা ঐ পাউডার মুখে মেখে জিঙ্ক অক্সাইডের মানে সফেদার অভাব পুষিয়ে নিতো। একটু মুখে

জ্বালা করতো, একটু আধটু চামড়াও ছড়ে যেতো, কিন্তু বিনি-পয়সার জিনিস। তাছাড়া পায়ে মাখার পাউডার মুখে মাখলে এই রকমই তো হবে। তাতে ছটফট করলে চলবে কেন!

সাহসী ষষ্ঠিচরণ
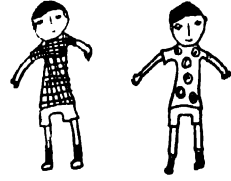
জগৎ-সংসারে যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই যে একটি দোদুল্যমানতা রয়েছে, শ্রীযুক্ত ষষ্ঠিচরণ হালদারকে দর্শন করবার বা শ্রবণ করবার পর এ-বিষয়ে কারো কোনো সংশয় থাকা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত হালদার যখনই কথা বলেন, ক্রমাগত দুলতে থাকেন এবং কাঁধে ঝাঁকি দিতে থাকেন। কেউ কেউ বলেন, দুলে দুলে ষষ্ঠিচরণ হৃদ্‌পিণ্ডের গতি অব্যাহত রাখেন এবং কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে মেরুদণ্ডটা ঋজু আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখেন। এই প্রথাদ্বয় শারীরবিজ্ঞানসম্মত কিনা সেটা বিশেষজ্ঞের বিবেচ্য কিন্তু ষষ্ঠিচরণকে প্রশ্ন করে জানা গেছে, 'হেবিট'।

অন্যান্য দশজনের মতই ষষ্ঠিচরণ হ্যাবিট বা অভ্যাসের দাস। তাঁর প্রধান অভ্যাস বা চিত্তবিনোদনের প্রণালী হলো শিকার বা যুদ্ধের গল্প করা। ঐ শীর্ণ, কোটরগতচক্ষু প্রৌঢ়ের মধ্যে যে তেজস্বিতা রয়েছে, তা তাঁর শিকার বা যুদ্ধের গল্প না শুনলে কখনোই অনুমান করা যাবে না, অন্যথায় তাঁকে খুব ভীরু কাপুরুষ বলে সন্দেহ হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, শ্রীযুক্ত হালদার নিজে কখনো যুদ্ধ যাননি বা শিকার করেননি। ষষ্ঠিচরণ-কথিত

সমস্ত শিকার ও যুদ্ধ-কাহিনীর নায়ক তাঁরই কোনো আত্মীয় বা বিশেষ পরিচিত কেউ।

ষষ্ঠিচরণের চরিত্র বোঝা যাবে যদি তাঁর সঙ্গে কেউ কখনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চায়; পথেঘাটে যদি কোথাও দেখা করার কথা হয়, দুপুরবেলায় ডালহৌসি স্কোয়ারে যদি হয়, তাহলে আপনি আমাকে টেলিফোনভবনের মুখে কিংবা জি পি ও-র পাশে অপেক্ষা করতে বলতে পারেন, কি বড়জোর ট্রাম-গুমটিতে, কিন্তু ষষ্ঠিচরণ বলবেন, 'ঠিক আছে, ম্যান্টনের বন্দুকের দোকানের সামনে দাঁড়াবেন।' বিকালে যদি হয়, তাহলে তার সঙ্গে ফোর্টের সম্মুখে দেখা হওয়ার প্রোগ্রাম করতে হবে।

এক সাহেব-বাড়ি থেকে একবার নীলামে তিনি এক নকল মাটির কামান কিনেছিলেন, তাঁর দু'কামরার ছোট ভাড়াটেবাড়ির একঘরের অর্ধেকটা জুড়ে সেই কামান রয়েছে। তাঁর মেয়েরা সেই কামানের ওপরে কয়েকটা বালিশের গদি মাপ করে তৈরী করে দিয়েছে, অতিথি-অভ্যাগত এলে তাঁর ওপরেই বসে। কামানের নলের ভিতরে গৃহিণী আচার, আমসত্ত্ব, ডালের বড়ি ইত্যাদি সযত্নে রক্ষা করেন।

খবরের কাগজ থেকে কাটা যুদ্ধের বহু ফটো ষষ্ঠিচরণের বাড়ির দেওয়ালে লাগানো। আর সব বন্যজন্তুর ছবি, সমস্ত ছবির নীচে বাংলা আর ইংরেজীতে বীভৎস সব বর্ণনা সেঁটে দেওয়া, তাঁর নিজের হাতে লেখা। একটি বর্ণনা, 'মিনিসিকো সাপ, উত্তর চীনের গহন পার্বত্য অঞ্চলে লালকাঁকরের মধ্যে থাকিতে ভালোবাসে। অত্যন্ত হিংস্র, ইহার বিষে বৃহৎ-বৃহৎ গবাদিপশুর দেড় মিনিটের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে, সামান্য মনুষ্যের কি হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কাহাকে কামড়াইলে তিন সেকেণ্ডের মধ্যে তাহার সমস্ত শরীর নীলবর্ণ

হইয়া যাইবে, একঘণ্টার মধ্যে মাথার চুল খসিয়া পড়িবে, চক্ষু দিয়া নীল কষ বাহির হইবে ;...'

শ্রীযুক্ত হালদারের শিকারের গল্পও সেইরকম। সমস্ত শরীর আন্দোলিত হচ্ছে, কাঁধে ঝাঁকি দিচ্ছেন, যখন থামছেন, ঠোঁট-দুটো থিরথির করে কাঁপছে, 'অতবড় চিতাবাঘ কলকাতা চিড়িয়াখানায় নেই। আমার ওয়াইফ কুড়িগ্রামের মেয়ে, কুড়িগ্রামে এক সময় গিজগিজ করতো চিতাবাঘ, তা সে-ও দেখেনি বাপের জন্মে ঐ সাইজের চিতা ; সেই চিতা একদিন আমাদের রান্নাঘরের উত্তরের কাঁঠালগাছের ডালে! তখন পাটগুদামে ম্যানেজারি করি। জলা-জঙ্গল দেশ, সাপ-খোপের ভয়, তার উপর কাঁঠালগাছের ডালে ঐ চিতাবাঘ কোথা থেকে এসে যে উঠলো বর্ষাকালে। আজ মুরগী ধরে, কাল বিড়াল ধরে আর নির্বিবাদে গাছের ডালে রাত কাটায়।

'আমার বৌদির ভাই পল্টু তখন স্টীমার কোম্পানীতে বুকিং-ক্লার্ক। খবর পেয়ে সে একদিন তার নিজের তৈরী গাদাবন্দুক নিয়ে চলে এলো। তারপর রাত্রে শোবার ঘর থেকে দরজা বন্ধ করে জানলার ফাঁক দিয়ে নল গলিয়ে করলো গুলি। বর্ষাকাল, বারুদ ভিজে সোঁদা হয়ে গেছে, প্রথমে গুলিই ফাটলো না কিন্তু জানলাদরজাসুদ্ধ সারা ঘরটা হুড়মুড় করে কেঁপে উঠলো। আবার চেষ্টা করতেই গুলি বেরুলো কিন্তু বন্দুকের বাঁট এমন ধাক্কা লাগলো পল্টুর বুকে, সারারাত অজ্ঞান হয়ে রইলো, জানলার একটা পাল্লা উড়ে গিয়ে চিতাবাঘের নাকের মধ্যে ঠকাস করে লাগলো, আর গুলিটা ঘুরে গিয়ে লাগলো উল্টোদিকের একটা কলাগাছে। নাকে জানলার গুঁতো লাগতে চিতাবাঘটা চোখ উল্টিয়ে গড়াতে গড়াতে পাশের ডোবায় পড়ে গেলো।

'পল্টুর জ্ঞান ফিরলো পরের দিন। কিন্তু ডোবার মধ্যে

চিতাবাঘটার লাশ খুঁজে পাওয়া গেলো না, আর সেই কলাগাছটা যাতে গুলি লেগেছিলো, একটাও কলা হলো না তাতে কোনোদিন, সেটা কেটে আমরা থোড়ের চচ্চড়ি করে খেলাম।

'আমার ওয়াইফের রান্না থোড়ের চচ্চড়ি খেয়েছেন কখনো ?' একটু থেমে ষষ্ঠিচরণ প্রশ্ন করলেন, প্রায় আকস্মিক প্রশ্ন, 'আপনি কি আমার ওয়াইফকে কখনো দেখেছেন ?'

আমি জানালুম, 'না সে সৌভাগ্য হয়নি আমার।' ষষ্ঠিচরণ তখন বললেন, 'তাহলে আর ওয়াইফ দেখলেন কি ? জানেন আমার ওয়াইফ কখনো মাছ কুটতে, তরকারি কুটতে হাতের আঙুল-টাঙুল কেটে গেলে কিছুতেই আয়োডিন, ডেটল কিছু লাগান না, স্রেফ একটু পান খাওয়ার চুন লাগিয়ে দেন, সঙ্গে সঙ্গে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, ঘা-টা কিছুই হয় না।'

অতঃপর ষষ্ঠিচরণ কি যেন ভেবে আবার বললেন, 'আচ্ছা, আপনার বাড়িতে কেউ শিকার-টিকার করতে পারে ?'

মাস কয়েক আগে আমার ছেলে তাতাই অনেক ঝগড়াঝাঁটি, কাঁদাকাটি এবং আন্দোলন করে একটি হাওয়া বন্দুক অর্থাৎ এয়ারগান কিনেছে। সে ছাড়া আমাদের বাড়িতে, আমাদের বংশে, পাড়ায়, অফিসে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ শিকারী নেই। এত কথা ষষ্ঠিবাবুকে না বলে বিনীতভাবে সামান্য করে বললাম, 'আজ্ঞে না।'

'এই দেখুন,' ষষ্ঠিচরণকে প্রবল উল্লসিত দেখালো, যেন রাজ্যজয় হয়ে গেলো এই ভাবে বললেন, 'শিকার করা কি সোজা কথা ! শিকার করতেন আমার মেজো মামাশ্বশুরমশায়। জয়রামপুর-হিতৈষীতে তাঁর মারা পাগলা শেয়ালের ছবি বেরিয়েছিলো, কলকাতার কাগজেও ছবি পাঠিয়ে ছিলেন ছাপবার

জন্যে, কিন্তু সম্পাদকরা পাগলা শেয়ালের ছবি ছাপতে সাহসই পেলে না, বিশেষ করে তখন কলকাতায় যা গরম।

'আমার বড়মামাশ্বশুর মেডেল পেয়েছিলেন বড়সাহেবের কাছে শিকার করার জন্যে। বড়সাহেবের তিব্বতী কুকুর, এই লোম, এই কানের লতি (হাত দিয়ে দেখালেন ষষ্ঠিচরণ)। নাম দিয়েছিলেন চুঁয়াচো। সেটা হঠাৎ একদিন ক্ষেপে গেলো। বড়সাহেবের নতুন মেম এসে সেদিনই জানলা-দরজার পর্দা পাল্টিয়েছিলো। সে তো আর জানতো না কুকুরটা নীল রং দেখলে ক্ষেপে যায়! সব পর্দা নীল রংয়ের। কুকুরটা ক্ষেপে গিয়ে প্রথমেই একটা পর্দা কামড়ে ছিঁড়ে ফেললো, তারপরে গুড-লাক লেখা একটা পাপোশ। খাঁটি বিলিতি পাপোশ, সেই আমলের এ্যাণ্ডারসনের দোকানের। বড়সাহেব এই খবর পেয়ে মামাশ্বশুরকে সঙ্গে করে অফিস থেকে ছুটে এলেন।' দম নেওয়ার জন্যে একটু থামলেন ষষ্ঠিচরণ, পকেট থেকে প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'ততক্ষণে চুঁয়াচো একেবারে ক্ষেপে গেছে। একটা ড্রেসিং-টেবিলের ওপরে উঠে দেয়ালঘড়িটা কামড়ানোর চেষ্টা করছে। বড়সাহেবকে দেখেই লাগালো এক ছুট, সোজা বাইরের লনে। বড়সাহেব আমার মামাশ্বশুরকে বললেন, 'ইসকো মার ডালো, গুপালবাবু।' মামাশ্বশুর সঙ্গে সঙ্গে দোনলা বন্দুক নিয়ে বারান্দায় গিয়ে কুকুরটাকে গুলি করলেন। কুকুরটা ছুটছে, থামছে, মামাশ্বশুরও গুলি করছেন। বারো রাউণ্ড গুলি করলেন। একটা গুলিও লাগলো না।' এইখানে ষষ্ঠিচরণ গর্বিতভাবে আমার দিকে তাকালেন, হাতের সিগারেটটায় বেশ ছুটো জোর টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, 'ততক্ষণে বড়সাহেব নীল পর্দাগুলো দেখতে পেয়েছেন, তাড়াতাড়ি পর্দাগুলো খুলে ফেললেন। নীল পর্দা দেখলে তাঁরও ভীষণ মাথা ঘোরে।

আর পর্দাগুলো খুলে ফেলা মাত্র চুঁয়াচো একেবারে শান্ত হয়ে গেলো। লেজ নাড়তে নাড়তে বড়সাহেবের কাছে ছুটে এসে পা চাটতে লাগলো। বড়সাহেব তো খুব খুশি। সঙ্গে সঙ্গে দেরাজ খুলে একটা সোনার মোহর বের করে মেডেল করে পরিয়ে দিলেন মামাশ্বশুরের গলায়। তিনি বললেন, 'গুপাল, তুমি চুঁয়াচোকো লাইফ সেভ কিয়া, তুমি বড়া শিকারী আছে।'

ষষ্ঠিচরণ হাঁটা শুরু করলেন, শুধু একবার পিছন ফিরে আমাকে বললেন, 'আমার ওয়াইফের নাকে দেখবেন, সেই মোহর ভেঙে তার মেজোমামী সাতটা নাকছাবি বানিয়েছিলো, তারই একটা দিয়েছিলো। এখনো আমার ওয়াইফের নাকে আছে।'

হল্লার রাজা
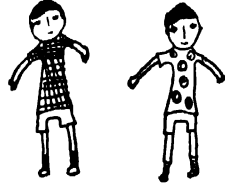
[এই গল্পের ঘটনা মাত্র কয়েক বছর আগের। কিন্তু এরই মধ্যে মধ্যে সে সব ঘটনা এখন ইতিহাসের পাতায় চলে গেছে। তুতু তখনো তাতাইবাবু হয় নি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ চলছে। তখন তুতুর ঠাকুর্দা-ঠাকুমা সবাই বাংলাদেশ থেকে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, স্বাধীন হওয়ার পরে আরো লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে আবার তারা দেশে ফিরে গেলেন। এই গল্প সেই সময়কার।]

হল্লার রাজার সঙ্গে কোথায় কোনোদিন দেখা হতে পারে এ কথা তুতু ভাবতেই পারে না। কিন্তু সত্যি সত্যি হল্লার রাজার সঙ্গে তুতুর দেখা হয়ে গেলো।

তুতুর ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, কাকা এরা সবাই থাকতেন বাংলাদেশে। কয়েক মাস আগে প্রাণের ভয়ে তাঁরা পালিয়ে এসেছিলেন, এখন দেশ স্বাধীন হওয়ায় তাঁরা আবার ফিরে গেলেন। তুতু বাবার সঙ্গে বনগাঁ পর্যন্ত গিয়েছিলো তাঁদের এগিয়ে দিতে।

বনগাঁতেই হল্লার রাজার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। বনগাঁ শহরের মধ্য দিয়ে ঘুরে যেখানে যশোর রোড সোজা থানার পাশ দিয়ে কাঠের পুল পেরিয়ে বাংলাদেশের দিকে চলে গেছে, সেখানেই একটা আমগাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে মাটিতে একটা ছেঁড়া চাদর বিছিয়ে বসেছিলেন হল্লার রাজা। একটু দূরেই তুতুর ঠাকুরমা, ঠাকুরদারা ট্রাকের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

তুতু প্রথমে ভালো করে লক্ষ্যই করেনি ভদ্রলোককে। গায়ে একটা ভীষণ দামী কাশ্মীরী শাল অথচ খুবই ময়লা, শালের নীচে ছেঁড়া পাঞ্জাবির হাতা বেরিয়ে রয়েছে, পরনের ধুতিও খুবই ছেঁড়া আর ময়লা। খালি পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ধুলো কাদা, কাঁধে একটা পেট ফোলা কাপড়ের ব্যাগ। ওঁর থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে ঠাকুরমার বাক্সের উপরে তুতু বসেছিলো। হঠাৎ একটা চাষাভুষো গোছের লোক দেশে ফিরবে বলে তার হাতেও সামান্য জিনিসপত্র, শেষ সম্বল ; এই ভদ্রলোকের সামনে থমকে দাঁড়াল। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করে বললো, 'বেঁচে আছেন রাজাবাবু, আমরা শুনে-ছিলাম আপনাকে মেরে ফেলেছে।' রাজা মৃদু হেসে বললেন, 'আমি একাই বেঁচে আছি।' 'বাড়ির আর সবাই ?' লোকটার এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা আবার ম্লান হাসলেন, 'তারা কেউ নেই, আমি ভাগ্যের দায়ে পালিয়ে বেঁচেছি। তোমরা সবাই বেঁচে আছো ?' 'লোকটা বললো, 'অনেকে আছি, অনেকে নেই। দেশে ফিরলে সব জানা যাবে।' তারপর প্রশ্ন করলো, 'এতদিন কোথায় থাকলেন ?' রাজা আঙুল তুলে একটু দূরে দেখালেন, 'ঐ মাদ্রাসা ক্যাম্পে।'

এর মধ্যে ঐ লোকটার সঙ্গীরা, যারা একটু দূরে দাঁড়িয়ে-ছিলো তারা তাগিদ দিতে লাগলো, 'এই চলে এসো লরি

ছেড়ে দেবে।' লোকটা রাজাকে 'আসি' বলে এগিয়ে গিয়ে সঙ্গের লোকদের বললো, 'উনি আমাদের হল্লার রাজা।' সবাই তাড়াতাড়িতে একবার ঘাড় ফিরিয়ে হল্লার রাজাকে দেখে পা ফেলে এগিয়ে গেলো।

তুতু বাক্সের উপরে বসে এই কথাবার্তা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলো। সিনেমায় যেমন দেখেছে মাথায় টাক নেই, জরির পোশাক নেই, এই হলো হল্লার রাজা! আস্তে আস্তে সাহস করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনিই হল্লা রাজা?' হল্লার রাজা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করলেন। তুতু আবার প্রশ্ন করলো, 'আপনার মেয়ের সঙ্গেই গুপী গাইনের বিয়ে হয়েছে?' প্রশ্ন শুনে হল্লার রাজা একটু চঞ্চল হলেন, বললেন 'গুপী গাইনের নাম তুমি জানলে কি করে?' তুতু বললো, 'কেন বইয়ে পড়েছি, সিনেমায় দেখেছি।' হল্লার রাজা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমাদের ওদিকের ছেলেপিলেরা এসব জানে না, পঁচিশ বছর এসব কোনো বই নেই, কোনো সিনেমা যায়নি।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'আমাদের বাড়ি হলো হল্লা, ময়মনসিংহ জেলায়। হল্লার আসল রাজা ছিলেন আমার ঠাকুরদার শ্বশুর। আমার ঠাকুরদা স্বর্গীয় গুপীন্দ্রনাথ গাইন। তিনিই হল্লার রাজার মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, পরে হল্লার রাজ্যও পান আর সেই থেকে আমাদের বংশের লোকেরাই হল্লার রাজা, যদিও রাজত্ব আর নেই।'

তুতু খুব মনোযোগ দিয়ে হল্লার রাজার কথা শুনছিলো। ইনিই তাহলে গুপী গাইনের নাতি। হঠাৎ তুতুর মনে হলো গুপী গাইন ভূতের কাছ থেকে যে জুতো জোড়া পেয়েছিলো সেটার কি হয়েছে, সেটা কি এখনো আছে? একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা হল্লার রাজাকে করতেই রাজা বললেন, 'সবই

গেছে, শুধু বহু কষ্টে সেটাকেই রক্ষা করেছি।' বলে সেই পেটফোলা ব্যাগের ভেতর থেকে একজোড়া অতি পুরনো ছেঁড়া নাগরা জুতো বের করে দেখালেন।

জুতো জোড়া দেখে তুতু বললো, 'আপনি এবার এটা পায়ে দিয়ে উড়ে চলে চলে যান না দেশে।' হল্লার রাজা বললেন, 'তাতো পারি কিন্তু এরা আমার দেশের এই লোকেরা, তাহলে ভাববে কি, কি মনে করবে বলো তো আমি যদি এদের সঙ্গে এক সঙ্গে না যাই।'

একটু পরেই অনেক লোক ভর্তি গাদাগাদি একটা ট্রাক এসে দাঁড়ালো। ট্রাকের থেকে একজন সরকারি লোক একটা লিস্ট থেকে নাম ধরে ডাকতে লাগলো, 'শচীন্দ্রনাথ গাইন।' আর ট্রাকের ভিতরে অনেকগুলো লোক, 'রাজাবাবু এইদিকে আসুন, এইদিকে' বলে হাত বাড়িয়ে এক টানে হল্লার রাজাকে ট্রাকের মধ্যে তুলে নিলো। ট্রাকের মধ্যে একটা বড় বস্তার উপরে হল্লার রাজা গিয়ে বসলেন, মাঘ মাসের বিকেলে তখন ছায়া খুব ঘন হয়ে এসেছে, ধুলো ওড়াতে ওড়াতে ট্রাক চলে গেলো।

অনেক দূর পর্যন্ত তুতু তাকিয়ে রইলো, রাজার কাঁধের ব্যাগের ফাঁকে জুতো জোড়া তখনো দেখা যাচ্ছে।

গজানন বিশ্বাস ও কুকুর
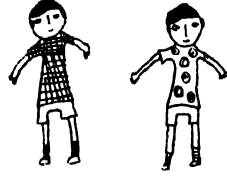
রাস্তায়ই হোক আর পার্কেই হোক, কিংবা কারো বাড়িতে বা বাজারে কোনো বড়রকমের কুকুর দেখলেই আমার গজুর কথা মনে পড়ে যায়। কি আশ্চর্য, এতদিন পরেও মনে পড়ে। তারপর কত গোলমাল, কাটাকাটি হয়ে গেল, ঝড় বাদলা, এমন কি অন্নদা সুন্দরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সামনের সেই বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছটাও একদিনে ঝড়ে উপড়ে পড়ে গেল। আমরাও কতকাল আর চিলাহাটিতে যাইনা, তবু এতদিন পরেও কুকুর দেখলেই গজুর কথা মনে পড়ে।

গজু মানে, গজানন বিশ্বাস। চিলাহাটি অন্নদা সুন্দরী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে আমাদের থেকে এক ক্লাস উপরে পড়তো। আসলে কিন্তু গজুর চেহারায় বা চরিত্রে কোথাও কুকুরের সঙ্গে মিল ছিলো তা নয়, বরং মাষ্টারমশাইরা অন্যান্য বিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তুর সঙ্গে গজুর তুলনামূলক আলোচনায় বহু সময়েই উৎসাহ বোধ করতেন।

গজু কিন্তু আমাকে খুব ভালবাসতো। গজুর অনেক অসাধারণ ক্ষমতা ছিলো। সেগুলি বহু সময়েই শুধু আমাদের

নয়, বড়দেরও অবাক করে দিতো। গজুর কাছে সেগুলি অবশ্য খুবই সাধারণ ব্যাপার। জাল নয়, খাঁচা নয়, খালি হাতে মাংলার চর থেকে দুটো টিয়া ধরে এনে গজু হাসতে হাসতে বলতো, 'সহজ। সকলেই পারে।' সহজ শব্দটা গজু অদ্ভুত-ভাবে উচ্চারণ করতো। 'হ'টাকে যথেষ্ট টেনে দিতো। প্রায় সহহজ বলতো আর কি।

এই সহহজই গজুর কাল হয়েছিলো। গজু অঙ্কে গোল্লা পেলো, সকলেই বললো, 'সহহজ।' গজু স্পোর্টের দিন পেটে ভয়ঙ্কর ব্যথায় আড়াই ফুটের বেশি লাফাতে পারলো না, ড্রিল মাষ্টার ভজেনবাবু বললেন, 'সহহজ।'

গজুর সহহজ ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই খুব সহজ ছিলো না। গজু আশ্চর্য কান নাচাতে পারতো, অমন কান নাচানো মানুষের পক্ষে যে সম্ভব, না দেখলে বিশ্বাস হবে না, ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'কি করে তুমি এত আশ্চর্য কান নাচাও।'

খচ্‌খচ্‌ করে কান নাচাতে নাচাতে গজু বললো, 'সহহজ,—কিছু না।'

সেই সহহজ, কিছুনা ব্যাপারটা কি, আমার জানতে ইচ্ছে হয়েছিলো। কেনই বা ইচ্ছে হবে না, বারো বছর বয়সে কার না সাধ হয় কান দুটো তালপাতার পাখার মতো, গরুর কানের মতো খচ্‌খচ্‌ করে নাচাতে।

গজু বলেছিলো, 'মাড়ির কোণায় যে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানটা অনেক বড় হলে আক্কেল দাঁত উঠবে, সেখানে আলজিবটা ঘুরিয়ে আলগোছে ঠেকিয়ে দিবি আর সেই সঙ্গে দুটো হাঁটু পাশাপাশি জুড়ে দিয়ে পুরো দম নিয়ে পেট ফোলাবি। তাহলে আর কিছুই ভাবনা নেই, দেখবি সঙ্গে সঙ্গে কান দুটো ওঠা-নামা করছে।' একটু থেমে কান নাচানো বন্ধ রেখে গম্ভীর মুখে বলেছিলো, 'হাঁ, ভালো কথা, রাত্রের দিকে

আর স্নানের সময় একটু ভালো করে সরষের তেল মাখিয়ে নিবি। তোদের কচি কান তো, খুব ব্যথা হতে পারে।'

শুনে খুবই আনন্দ হয়েছিলো। কিন্তু মাড়ির ফাঁকা জায়গায় আলজিব ঠেকানো, বহু চেষ্টা করে দেখেছি গত পনেরো বছর ধরে চেষ্টা করেছি যখনই একলা একলা থাকি কিংবা কখনো কোথাও কোনো বড় কুকুর চোখে পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে গজুর কথা মনে প'ড়ে কান নাচানোর খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু অসম্ভব, অতবড় আলজিব আমার নেই। সেই বয়সে চেষ্টা করে করে কানের কিছু হলো না কিন্তু আলজিবে ঘা হয়ে গিয়েছিলো, দাঁতের মাড়ি ফুলে গিয়েছিলো। সাতদিন ইস্কুল কামাই করতে হয়েছিলো। তারপর থেকে কণ্ঠস্বরই কেমন পালটে গেছে আমার।

এক হপ্তা পরে খুব কাবু অবস্থায় ইস্কুলে ফিরে গিয়ে গজুর খোঁজ করলাম। গজু নেই, কোথায় নাকি মামার বাড়ি না কোথায় চলে গেছে। দিন দশেক পরে ফিরলো, সঙ্গে সঙ্গে ধরলাম, 'তোমার পরামর্শ মতো চেষ্টা করতে গিয়ে সাতদিন শয্যাশায়ী ছিলুম। এতবড় আলজিব কারো থাকে নাকি ?'

গজু অবাক হয়ে বললো, 'বড় আলজিব দিয়ে কি হবে ? খুব চেঁচাতে চাস নাকি, তা তোর গলার স্বরও তো বেশ পাল্টিয়ে গেছে।'

আমি বললুম, 'তাহলে কান নাচানো ?'

গজু বললো, 'ও, হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোকে বুঝি কান নাচাতে বলেছিলাম মাড়িতে আলজিব ঠেকিয়ে।' বলে খুব হাসলে একচোট, 'তারপরে আর কি কি বলেছিলাম ?'

তখনো জিভের ঘা ভালো করে শুকোয়নি, আমার খুব রাগ হলো, 'তাহলে তোমার সবই ইয়ারকি ?'

গজু বললো 'আরে, না না। আলজিব মাড়িতে ঠেকালে দেখবি কান নাচে, না, নাচে না।'

'কিন্তু নাচাবো কি করে? আলজিব যে মাড়ি পর্যন্ত পৌঁছোলই না।' আমি কাতর কণ্ঠে বললাম।

'সে আর কঠিন কি, সহজ।' গজু আবার কান নাচাতে লাগলো, 'কান নাচালেই দেখবি আলজিব মাড়িতে ঠেকে গেছে, এই গ্যাখ।' গজু মুখ হাঁ করে দেখলো। কিন্তু কিছু দেখা সম্ভব হলো না, তাছাড়া ওর মুখে ছিলো ভীষণ দুর্গন্ধ। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান আমি আজো করতে পারিনি, কান নাচালে আলজিব মাড়িতে ঠেকে যায়, না, আলজিব মাড়িতে ঠেকালে কান নাচে?

এ রকম ঘটনা হামেশাই ঘটতো। সব লিখলে মহাভারত হয়ে যাবে, আর এতদিন পরে মনেও নেই। গজু একবার আগুন খাওয়া দেখিয়েছিলো ইস্কুলে প্রাইজের দিন, প্রায় হাজার খানেক দর্শকের সামনে। খুব হাততালি পড়লো, গজু দু-দুবার দেখালো আগুন খাওয়া। গন্‌গনে আগুন মুখের মধ্যে গিলে ফেললো, তারপর মুখ থেকে উগরে বার করলো একটার পর একটা আগুনের হল্কা। গজুর কিছুই হলো না, কিন্তু মধ্য থেকে বাঁ পাশের উইংসটা একদম পুড়ে গেলো কি করে কেউ বুঝতেই পারলো না।

এসব কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এখন গজু কোথায় আছে কে জানে? কে জানে সে সত্যিই এখন ম্যাজিস্ট্রেট-ট্যাজিস্ট্রেট কিনা, কোথায় যেন সেইরকমই শুনেছিলাম। তার চোখে যদি এ-লেখা পড়ে তবে আর রক্ষা নেই।

(ভাই গজু, যেখানেই থাকো এ লেখা যদি তোমার নজরেও পড়ে, ক্ষমা করে দিও। তোমার জন্যে আজ পর্যন্ত কষ্ট কম

করিনি, এখনো পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাড়ি টন্‌টন্‌ করে, এসব কথা বিবেচনা করে মার্জনা করে দিও।)

আমরা তখন ক্লাস টেনে উঠেছি। গজুও ফেলটেল করে আমাদের সঙ্গে এসে জুটেছে। ইস্কুলে সরস্বতীপুজো হবে, তার বছর বছর অন্য সব ইস্কুলের মতো আমাদের ইস্কুলেও ক্লাস টেনের ছেলেরাই বহন করতো। দুজনে মিলে এক এক দলে চাঁদা তুলতে হবে। তখন পাড়ায় পাড়ায় এতো পুজো ছিলো না, ইস্কুলের পুজোই আসল পুজো। শহরের সকলেই চাঁদা দিতো। পুজোর দিন কুড়ি আগে থেকে রসিদ বই হাতে আমরা ধর্ণা দিতাম দুয়ারে দুয়ারে।

আমার ভাগ্যে আমার দলে পড়েছে গজু, তবে যে এলাকাটা পেয়েছি সেটা ভালো এলাকা। সকলে ভালো মন্দ চাঁদা দেয়, সহরের সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু অঞ্চল—আমলাপাড়া।

আমলাপাড়ায় মহানন্দ উকিল আবার সবচেয়ে বড়লোক। তার ওখানে গেলে ভালো চাঁদা পাওয়া যাবে, কিন্তু সেখানে এক বিরাট বিপদ। এমনিই কুকুরে আমার খুব ভয়, তার উপরে মহানন্দ উকিলের বাড়িতে বিরাট এক এ্যালসেসিয়ান কুকুর। বাইরে গেট থেকে উঁকি দিয়ে দেখেছি। চেন খোলা, রাতদিন কম্পাউণ্ডের মধ্যে হাঁ হাঁ করে ঘুরে বেড়ায়।

গজুকে কথাটা বলতেই হেসে উড়িয়ে দিলো, 'সহজ, কুকুর দেখে ভয় পায় নাকি ?' খুব একচোট সে হাসলো।

আমি বললাম, 'কুকুরটাকে দেখলে তুমি একথা বলতে না—'

'যে কোনো কুকুর বাধ্য করার কায়দা আমি জানি'—গজুর যেন রীতিমত গর্বভাব দেখলাম, তারপর ফিস ফিস করে বললো, 'একটা চোরের কাছে শিখেছি। তোকেও শিখিয়ে দেবো।'

আমার শিক্ষার খুব ইচ্ছে ছিলো তা নয়, কিন্তু কৌতূহল

হলো। গজুকে প্রশ্ন করতে সে বললো, 'নাক শোঁকা শুঁকি কাকে বলে, জানিস? যত দুর্দান্ত কুকুরই হোক না, একবার তার নাকে নাক ঠেকিয়ে শুঁকে ফেলতে পারলেই হলো। চিরদিনের মতো সেই কুকুর তোকে দেখলেই লেজ নাচাবে তাহলে।'

আমার ব্যাপারটা খুব বিশ্বাস ছিলো তা নয়. কিন্তু গজু নিজের উপরেই যখন কুকুর বাধ্য করার দায়িত্ব নিলো, ভাবলাম দেখাই যাক্ না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ঘটলো ব্যাপারটা। আমরা সবে মহানন্দ উকিলের গেট খুলে কম্পাউণ্ডে পা ফেলেছি, কুকুরটা বিদ্যুতের মতো ছুটে এলো ঘেউ-ঘেউ করে। বা-বাঃ সেকি গর্জন। কিন্তু গজু অকুতোভয়। ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে নিজের নাকটা এগিয়ে দিলো কুকুরের নাকের কাছে। তারপরেই গজুর আর্তচীৎকারে মহানন্দবাবুরা ছুটে বেরিয়ে এলেন, ডাক্তার এলো, হাসপাতালে গজুর নাক সেলাই হয়ে ঘা শুকোতে সাড়ে চার মাস লেগে গেলো।

ভালো হয়ে চিলাহাটি ছেড়ে দিয়ে গজু কোথায় যে চলে গেলো আর দেখা হয়নি। তোমাদের প্রাইজ-সভা-টভায় কোনোদিন নাকে কুকুরের দাঁতের দাগ নিয়ে কোনো ম্যাজিষ্ট্রেট এলে জেনে নিওতো, তার নাম গজানন বিশ্বাস কিনা? তা হলে তোমরা তাঁর কাছে থেকে কান-নাচানোটাও শিখে নিতে পারো।

শখের গোয়েন্দা

'হিঁয়া পর খুন্‌কা তদন্ত হোতা হ্যায়!' হিন্দীতে সাইনবোর্ডে কালোর ওপরে স্পষ্ট করে লাল অক্ষরে লেখা, অর্থাৎ কিনা 'এখানে খুনের তদন্ত করা হয়।'

বছর কয়েক আগে বাংলার বাইরে এক মফস্বল শহরে বেড়াতে গিয়ে বাজারে চৌমাথার মোড়ে সদর রাস্তায় এই বিজ্ঞাপন পড়ে চমকে গিয়েছিলাম। আমি উঠেছিলাম স্থানীয় থানার দারোগাসাহেবের বাসায়। মনে মনে ভাবলাম তা হলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এদেশেও চালু হয়ে গেলো। যদি বাজারের রাস্তায় প্রকাশ্যেই তাঁরা এই রকম হত্যা-রহস্য উন্মোচনের দপ্তর খুলে বসেন তাহলে দারোগাসাহেবদের আর কি করবার রইলো? দারোগাসাহেবের বাসায় ফিরে তাঁকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করতে হেসে উঠলেন, আরে মশায় খুনকা তদন্ত মানে রক্ত পরীক্ষা, খুন অর্থ ব্লাড আর তদন্ত হলো একজামিনেশন। ওখানে ব্লাড একজামিনেশন করে, ওটা একটা ক্লিনিক।

শুনে হতাশ হয়েছিলুম, শখের গোয়েন্দা সম্পর্কে আমার বহুদিনের জিজ্ঞাসা। এতদিন পরে আমার জিজ্ঞাসা মিটতে বসেছে।

খবরের কাগজ অফিসে আমার অল্পবিস্তর যাতায়াত আছে। লেখাপত্র জমা দিতে, টাকাপয়সা নিতে নিজেকেই যেতে হয়, ফলে অনেকের সঙ্গেই আমার যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছে। তাঁদের প্রত্যেকেই যে লেখক বা সাহিত্যশাখার লোক তা নন, কেউ বিজ্ঞাপন বিভাগের, কেউ অ্যাকাউন্টস দপ্তরের, কেউ বা অনুসন্ধান টেবিলের কর্মী।

তাঁদেরই একজন, অনাদিবাবু, বিজ্ঞাপন বিভাগে কাজ করেন। আমার প্রার্থিত সরকারী সম্পাদকমহোদয়ের সঙ্গে দেখা হতে আরো আধ ঘণ্টখানেক দেরি হতে পারে এই খবর পেয়ে আমি অনাদিবাবুর টেবিলে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। অনাদিবাবুর কাজ আর কিছু নয় বক্স নম্বর দিয়ে যারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন করেন, তাঁদের নম্বরে কোনো চিঠি এলে, বক্স নম্বর কেটে খাতা খুলে মিলিয়ে সেখানে আসল ঠিকানা লিখে দেন। আসল ঠিকানা মানে ডাকের ঠিকানা।

অনাদিবাবুকে খুব ব্যস্ত দেখলাম, অনেকগুলো চিঠি সামনে। লাল কালি দিয়ে বক্স নম্বর কেটে ঠিকানা বসাচ্ছেন। আমার চুপ করে বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বসে বসে অনাদি-বাবুর কাজ দেখতে লাগলাম। যে কাজ আমি করি না অথচ কাজটা বুঝতে পারি এইরকম কিছু দেখতে ভালোই লাগে। বেশ একটা বৈচিত্র্য আছে। এই বকস নং ৫২৭ কেটে লেখা হলো শ্রীযুক্তা কাদম্বিনী আঢ্য, বড় নবগ্রাম, নদীয়া, বকস নং ৩৩৩ কেটে লেখা হলো মহম্মদ গিয়াস শেখ, দিলদাগিপুর চকবাজার, মুর্শিদাবাদ।

ভালোই চলছিলো, হঠাৎ একটা চিঠির কাটা ঠিকানায় এসে চোখ আটকে গেলো। মিঃ নিবারণ সামন্ত। প্রাইভেট ডিটেকটিভ, তারপরে বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম। ঠিকানা দেখলাম আমার বাড়ির খুব কাছেই। হাজরা মোড় থেকে

আমার বাড়ি পশ্চিমে দেড় মিনিটের রাস্তা, মিঃ সামন্ত থাকেন পুবদিকে, নম্বর দেখে মনে হলো একেবারে মোড়ের কাছেই।

কিছু অবৈধ কৌতূহল আর দশজন সাধারণের মতই আমারো রয়েছে। আমি ঠিকানাটা মনে মনে মুখস্থ করে ফেললাম, ঠিক করে ফেললাম এই মিঃ সামন্তের সঙ্গে অবিলম্বেই দেখা করবো।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, ভদ্রলোকটিকে একবার চর্মচক্ষে দেখতে হয়। আশৈশব এঁর কথা রহস্যগ্রন্থে পাঠ করে এসেছি। বহু বিনিদ্ররজনী বিছানায় শুয়ে-বসে এঁরই কেরামতির কথা ভেবে বিহ্বল, বিচলিত, উত্তেজিত হয়েছি। ওভারকোট, দস্তানা, দামি বর্মাচুরুটের গন্ধ, সাইলেন্সার রিভলভার, ব্যক্তিগত ল্যাবরেটারি, ক্রাইম জার্নালের সর্বশেষ সংখ্যার ফুটনোটে কি একটা দুর্বোধ্য সঙ্কেত একসঙ্গে সব মাথার মধ্যে ভিড় করে এলো।

আমার বহুদিনের একমাত্র হিরো আমার বাড়ির এতো কাছে থাকেন, নিজে থেকে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আত্মপ্রচার করেছেন, বিজ্ঞাপনটি অবশ্য যথাসময়ে আমার নজরে পড়েনি, কিন্তু আজ যখন সৌভাগ্যক্রমে এঁর নাম-ঠিকানা সংগ্রহ করতে পেরেছি এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবোই।

মনে মনে ভাবনার চেষ্টা করতে লাগলাম, হাজরার মোড়ে প্রতিদিন সকালে বিকালে এতো যে লোকজন দেখি তাঁদেরই মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ মিঃ নিবারণ সামন্ত। কিন্তু কাউকে দেখে কি কখনো সেরকম সন্দেহ হয়েছে, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না তেমন বিশিষ্ট চেহারার কাউকে যাকে মিঃ সামন্ত বলে ভাবতে পারি, মেলাতে পারি আমার বহুদিনের প্রার্থিত-দর্শন হিরোর কাল্পনিক চেহারার সঙ্গে।

চিরকাল যাঁর কথা গল্প-উপন্যাসে পাঠ করে এলাম, যাঁর

সম্পর্কে 'আমার ধারণাই জম্মে গিয়েছিলো। তিনি এই নশ্বর পৃথিবীর কেউ নন। একেবারেই অশরীরী, অলৌকিক। যাঁকে এতোকাল কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা বলে ভেবেছি তিনি আমারই পাড়ার বাসিন্দা, প্রতিবেশী। ভেবে বিস্মিত হলাম এবং স্থির করলাম আজ বাড়ি ফিরে সন্ধ্যাবেলাতেই দেখা করতে যাবো এঁর সঙ্গে।

উদ্দেশ্য আর কিছু নয় শুধু দেখা করা, পরিচিত হওয়া। কেননা আমার নিজের এমন কোনো রহস্য বা গোপনীয়তায় অংশ বা কৌতূহল নেই যার জন্যে গোয়েন্দা প্রয়োজন হতে পারে।

মনে মনে মুখস্থ করে রাখা ঠিকানা মিলিয়ে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় মিঃ নিবারণ সামন্ত প্রাইভেট ডিটেকটিভমহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হলাম।

অত্যন্ত সাধারণ চেহারার আটপৌরে ছোট একতলা বাড়ি। আমি সামনের দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লুম, দরজায় কলিং বেল ছিলো, টিপবার সাহস পেলুম না ; হয়তো ঠিক এই মুহূর্তে কোনো আততায়ীর আসার কথা আছে, কলিং বেলের মধ্যে কারেন্ট পাশ করানো হচ্ছে, ছোঁয়া মাত্র মূর্ছা যাবে। অন্তত এই রকম ঘটনা এক গোয়েন্দা কাহিনীতে পড়েছিলাম, তাই একটু সাবধান হয়েই প্রথম থেকে চলেছিলাম।

কড়ানাড়ার মিনিট খানেকের মধ্যে এক ভদ্রলোক এসে দরজা খুলে দিলেন। আমি তাঁকে বললুম, 'আমি মিঃ সামন্তকে চাই।'

তিনি জানালেন, 'এ বাড়িতে সবাই সামন্ত। আপনার কোন্ সামন্তকে চাই।'

'আজ্ঞে, মিঃ নিবারণ সামন্ত।' তাঁর প্রশ্নের উত্তর শুনে তিনি আমাকে বসতে বলে ভিতরে চলে গেলেন। ঘরের

ভিতরে বসে নজর করলাম। যথারীতি সাধারণ গৃহস্থের ঘর কয়েকটা চেয়ার, একটা টেবিল, একটা সতরঞ্চিমোড়া তক্তো-পোষ, দেয়ালে দুটো টিকটিকি, একটা গত বছরের ক্যালেণ্ডার!

বাড়ির ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে আমাকে নমস্কার করে একটা মুখোমুখি চেয়ারে বসলেন। তারপর আত্মপরিচয় দিলেন, 'আমিই নিবারণ সামন্ত।'

আমি যুগপৎ বিস্মিত ও আহত হলাম। আমার কল্পনার গোয়েন্দাপ্রবরের সঙ্গে এর কিছুই মিলছে না। ওভারকোট নেই, তার বদলে লংক্লথের ফুলশার্ট। কোথায় সেই কড়া গন্ধ বার্মিজ চুরুট ছয় ফুট দেড় ইঞ্চি উচ্চতা। তাঁর বদলে মাঝারি উচ্চতার কালোরঙের অতি সাধারণ এক ভদ্রলোক বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তিনিই কিনা গোয়েন্দার ভূমিকায়।

খুবই আশাহত হলাম। তবু এসেছি যখন কি আর করা যাবে। প্রতিনমস্কার করতে কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলো, নমস্কার সেরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনিই প্রাইভেট ডিটেকটিভ?'

নিবারণবাবু (এরপর আর মিঃ সামন্ত বলতে পারছি না) পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে ধরালেন, তারপর টেবি-লের দেরাজ থেকে একটা ফাইল বের করে খুলে বললেন, 'আপনার নাম?'

আমি নাম বললাম এবং তাঁর আত্মপ্রত্যয় দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, তিনিই সেই বিজ্ঞাপিত প্রাইভেট ডিটেকটিভ্। বেশ মিনিট দশেক ধরে ফাইল ঘাঁটা-ঘাঁটি করে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমার চিঠি কবে পেয়েছেন?

আমি বিনীতভাবে জানলাম যে, আমি তাঁর কাছ থেকে কোনো চিঠি পাই নি।

'তবে, আপনি আমাকে কবে চিঠি দিলেন?' গোয়েন্দা-প্রবর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

এধারে আমি জানালাম, 'আমি তো আপনাকে কোনো চিঠি দিই নি।'

নিবারণবাবু কেমন বিচলিত হয়ে পড়লেন, 'তা হলে আপনি এখানে এলেন কি করে?'

'কেন?' প্রশ্ন আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলো, কেননা তাঁর সংশয়ের কারণ আমার আগেই বোঝা উচিত ছিলো। আমি যে পত্রিকা দপ্তর থেকে হঠাৎ, তার বক্স নম্বরের আসল ঠিকানা পেয়ে গেছি, বে-আইনীভাবেই পেয়েছি, সে খবর তো আর তিনি জানেন না।

আমার 'কেন' শুনে তিনি বললেন, 'আমি তো বক্স নম্বরে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। কেউ বক্স নম্বরে চিঠি দিলে আমি যদি তাঁকে ঠিকানা না জানিয়ে উত্তর না দিই তা হলে তিনি আমার ঠিকানা কি করে জানলেন?'

বিড়িতে একটা জোর টান দিয়ে হতভম্বের মতো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন নিবারণবাবু। তারপর সোজা-সুজিই প্রশ্ন করলেন, 'আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়? আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ্ তাই বা জানলেন কি করে?

আমি স্পষ্ট করে কিছু ব্যাখ্যা করবো কিনা ভাবতে লাগলুম।

ততক্ষণে নিবারণবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে করজোড়ে আমাকে বললেন, 'আমাকে মাপ করবেন। আপনার কোনো সমস্যা থাকলে তার সমাধান আমার কর্ম নয়। ঠিকানা দিলে আমি বাড়ি খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু বক্স নম্বর দেখে বাড়ি খুঁজে বের করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি আমার চেয়েও বড় গোয়েন্দা।'

নিবারণবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, আর ধীরভাবে আমি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

ব্রজেন্দ্র কর থেকে বাজিকর
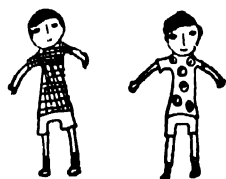
বেট, বেটার, বেষ্ট। আমার বন্ধু ব্রজেন্দ্রমোহনের অভিধানে গুড্ বলে কোনো শব্দ ছিলো না। তার স্থান দখল করেছিলো ঐ বেট। এই বেঁটে খাটো গোলগাল মানুষটি যার আসল নাম একদিন সবাই প্রায় ভুলে গিয়েছিলো। ব্রজেন্দ্রমোহন কর থেকে বাজিকর এই উপাধি লোক মুখে।

কথায় কথায় বাজি লড়তো সে। এক বাজি থেকে আরেক বাজি তার থেকে আরেক বাজি যতক্ষণ না প্রতিপক্ষ বলছে, 'বাবাজি ছেড়ে দাও' অথবা ডিগবাজি খাচ্ছে। ব্রজেন্দ্র শুধু বাজিই লড়তো না, বাজি জিততেও পারতো। অসাধারণ বাজিকরী প্রতিভা ছিলো ব্রজেন্দ্রমোহনের।

অতি শৈশবকালেই তার এই প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিলো বলে শুনেছি। ব্রজেন্দ্রমোহনের জবানিতেই বলছি।

...একটা ঘটনা। বাড়ি ভর্তি লোক। তখন আমার বয়েস বড় জোর সাত আট। অনেক বাচ্চা ছেলে আমারই মতন সারা বাড়িতে। তাদের কারোর কাছে মার্বেল, নানা রঙীন খেলনা। সব কিছুর ওপরেই লোভ হচ্ছে। সবই আমার চাই কিন্তু শরীরে বড় দুর্বল ছিলাম। গায়ের জোরে

কিছু করা সম্ভব ছিলো না। তাই সেই বয়সেই বাজি ধরায় এক্সপার্ট হলাম। সবাইকে বাজিতে প্রলুব্ধ করতাম, তারপর তারা হারতোই কোন-না-কোন কারণে এবং তাদের সম্পত্তি আমি দখল করতাম। ওদের সকলের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেঁটে ছিলুম। এ খবরটা আমি ছাড়া ওরা প্রায় কেউই জানতো না। প্রথমে আমি ওদের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিতাম, কে বেশী লম্বা। জানোই তো বাচ্চা ছেলেরা এ সব ব্যাপারে কত সচেতন। তার পরেই কায়দা করে বেট ঘুরিয়ে দিতাম! কে বেশী বেঁটে। আর প্রত্যেকবারই বেঁটে আমি জিতে যেতুম।···

কিন্তু আজ যা ঘটলো সেটা অভাবনীয় বলা চলে। কয়েক-দিন ধরে টানা বর্ষার পর আজ দুপুরে একটু রোদ উঠেছিলো। এখন রাত্রির দিকে আকাশটাও বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছে। ছটা নটার শোতে সিনেমা দেখেছি আমরা চারজন। আমি ব্রজেন্দ্র-মোহন, কপিলদেও আর বনমালী। তারপর থেকে সারা চৌরঙ্গীতে বোঁ বোঁ করে ঘুরে সারাক্ষণ বনমালী কেবল কথা বলে গেছে। ক্রমাগত বকবকানিতে মাথা ধরে গেছে তিন-জনেরই। বনমালীকে মহেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, 'বনমালীবাবুর কি মাথা ধরেছে ?' বনমালী জানালো, 'না ও জিনিসটা নেই।'

কোন্ জিনিসটা ওর নেই। মাথা, না মাথা ধরা। ব্রজেন্দ্র-মোহন আর কপিলদেও পরস্পর একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। তাদের চোখের চাউনি দেখে স্পষ্ট বুঝলাম এরা দুজনে এখনই একটা বাজি লড়ে যাবে এই নিয়ে। সন্ধ্যা থেকে অত্যন্ত পঁচিশবার এই ধরণের বেট পড়েছে। তেইশ-বার জিতেছে ব্রজেন্দ্র আর দুবার মাত্র কপিলদেও। সে ক্রমাগত হারছে। কিন্তু ওর কেমন ঝোঁক চেপে গেছে 'হামি বাজি রাখলাম দোশ রূপেয়া, এবার দেখে লেবো!' কিন্তু প্রত্যেক-বারই ব্রজেন্দ্রমোহন দেখে নিয়েছে।

সে যা হোক, বনমালীর মাথা নেই, না মাথাধরা নেই, এই নিয়ে বাজি লড়বার আগেই একটা কাণ্ড ঘটালো। আমরা গড়ের মাঠের মধ্যে ট্রাম লাইন ধরে হাঁটছিলাম। গাছের ছায়ায় ছায়ায় একটু অন্ধকার। ট্রাম কমে এসেছে, প্রায় নেইই। দূর থেকে একটা ট্রাম অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আসছে দেখা গেলো। রাত্রিবেলা কোনো নামা ওঠা নেই। না থেমে খুবই তাড়াতাড়ি চলেছে ট্রামটা। আমরা চারজনেই লাইনটা থেকে একটু সরে দাঁড়ালাম।

এর মধ্যে হঠাৎ একটা লোক যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুলো। হাতে একটা ব্যাগ, সেই দ্রুত চলমান ট্রামটার দিকে ভীষণ দৌড়ে ছুটে গেলো।

লোকটা পাগল নাকি। আত্মহত্যা করতে যাছে, না চুরি চামারী কিছু করে পালাচ্ছে। রাত্রে, এই রাত সাড়ে দশটার পরে গড়ের মাঠে যে এরকম চুরি বা আত্মহত্যা না-হয় তাতো নয়। কিন্তু আমি এতসব ভাববার আগেই কপিলদেও আব ব্রজেন্দ্রমোহন আবার বাজি ফেলেছে।

কপিলদেও বললো, 'চোট্টা ভাগতা হায়।'

'না, লোকটা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, বাজি?'

'হ্যাঁ বাজি, দশটাকা' ব্রজেন্দ্রের বাজির জবাবে কপিলদেও বাজি ধরলো।

এর মধ্যে অজ্ঞাতভাবে ঘটলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা। ট্রামটা এসে গেছে, লোকটাও দৌড়ে ট্রামটার কাছে এসেছে, এমন সময় বনমালী হঠাৎ এক ঝাঁপে গিয়ে লোকটাকে, পাকড়ে ধরে চিৎ করে ফেলে দিয়েছে। ট্রামটা একটুও না না থেমে উর্ধ্বশ্বাসে চলে গেলো। বনমালী আর সেই লোকটা আত্মহত্যাকারী অথবা পলায়নপর দুর্বৃত্ত, দুজনে ট্রাম লাইনের

পাশে গড়াগড়ি যেতে লাগলো। আমরা তিনজনে, নির্বাক বিস্ময়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

বনমালীকে সেই লোকটার কবল থেকে এবং সেই লোকটাকে বনমালীর কবল থেকে ছাড়াতে আমাদের তিন-জনকে বিশেষ বেগ পেতে হলো। এইবার অস্পষ্ট আলোয় লোকটার দিকে তাকালাম মাঝবয়সী হিন্দুস্থানী, কোনো অফিসের দারোয়ান বা চাপরাসী ঐ ধরনের কিছু হবে! অন্ততঃ দেখে তাই মনে হয়। জাপটা জাপটিতে মুখের মধ্যে, শরীরেরও কোথাও কোথাও ধুলো লেগেছে পরনের ময়লা ফতুয়াটা গেছে ছিঁড়ে। বনমালীর শখের ছিটের শার্টটা শতছিন্ন, বা ভুরুর উপরে কপালটা এর মধ্যেই ফুলে গেছে। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও লোকটা যা বললো, মর্মান্তিক।

'লাস্ট টেরাম, মেরা লাস্ট টেরাম চলা গিয়া!'

বনমালীর আক্রমণে লোকটা হাওড়া যাওয়ার লাস্ট ট্রাম মিস্ করেছে। তার জন্যেই এত দৌড়ে এসেছিলো, যাতে ট্রামটা চলে না যায়। অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেছে। একেবারে কিছুই বুঝতে পারছে না। হাওড়ার দিকে কোন্ এক বস্তিতে থাকে, এখন এত রাত্রিতে হেঁটে ফিরতে হবে।

বনমালীর বিবেক বোধহয় দংশন করলো। সে বললে, 'আপনারা দুজনেই বাজি হেরেছেন, এই লোকটাকে পাঁচ পাঁচ দশ টাকা দিয়ে দিন। দেখছেন এর অবস্থা।' যেন এর এই অবস্থার জন্যে কপিলদেও আর ব্রজেন্দ্রই দায়ী। যে যা হোক অবশেষে সেই লোকটাকে দুটাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে তখনকার বাজি লড়া শেষ হলো। আমরা যে যার মত বাড়ি চলে গেলাম।

কপিলদেও পাঁড়ে এই নামটা হয়তো কারো কারো কাছে

পরিচিত মনে হতে পারে। কপিলদেওর সঙ্গে অবশ্য আমার অতি সম্প্রতি আলাপ হয়েছে মহেন্দ্র মারফৎ। কপিলদেও এ বছর আন্তপ্রাদেশিক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে যে মোটর প্রতি-যোগিতা হয়েছিল তাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অমন দুঃসাহসী দ্রুতগামী মোটর ড্রাইভার নাকি এখন ভারতবর্ষে আর নেই, কেউ কেউ বলে এশিয়াতে, সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডেই নেই।

সেই কপিলদেওকেও ব্রজেন্দ্র হারিয়েছে. (বিশ্বাস করা যায়না), মোটর প্রতিযোগিতাতেই বাজি রেখে। অথচ ব্রজেন্দ্র, আদৌ গাড়ি চালাতে জানে না। আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। কপিলদেও পাঁড়ে মোটর রেসে জিতবার পরে একদিন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে খুব গল্প করছিলো : এমন গাড়ি চালাবে, ট্রেন মানবেনা, ঝোপঝাড় মানবেনা, ও ছাড়া আর সে গাড়িতে কেউ বসে থাকতে পারবেনা, ছিটকে পড়ে যাবে। ব্রজেন্দ্রমোহন পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। এত সব কথা শুনে পাঁড়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে যেচে আলাপ করে। ব্রজেন্দ্রমোহন স্পষ্টই বলে, 'দেখুন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আপনার নাম আমি আগেই শুনেছি। আজ হঠাৎ দুএকটা টুকরো কথা শুনে বড়ই আলাপ করতে ইচ্ছা হচ্ছে।' এইভাবে ক্রমশ আলাপ জমিয়ে পাঁড়েকে বাজি লড়তে প্রলুব্ধ করে।

অবশ্য বাজির শর্তও পাঁড়ের দিক থেকে খুবই লোভনীয়। পাঁড়ে যত তাড়াতাড়ি পারে যেমন করে হয় গাড়ি চালাবে। একটা হুড খোলা জিপ। সেই জিপে ব্রজেন্দ্র আর গজেন্দ্র ব্রজেন্দ্রের ছোট ভাই। কলকাতা থেকে যশোর রোড ধরে বনগাঁ পর্যন্ত চালিয়ে যাবে। ব্রজেন্দ্র টুঁ শব্দটি করতে পারবেনা, গাড়ির গতি ঝড়ের মতই হোক আর বিদ্যুতের মতই হোক। ব্রজেন্দ্রের দিক থেকে যদি কোনো টুঁ শব্দটিও হয়,

ব্রজেন্দ্র দেড়শো টাকা দেবে পাঁড়েকে, আর যদি তা না হয় পাঁড়ে দেবে ব্রজেন্দ্রকে।

এক রবিবারের খুব ভোরবেলা পাঁড়ের জিপ বেরুলো ব্রজেন্দ্র আর গজেন্দ্রকে নিয়ে। তাকে কি বেরুনো বলা যায়, অটোমবিল রেসের পয়লা নম্বর লোকের হাতে উল্কার মতন চলছে গাড়ি। কিন্তু ব্রজেন্দ্র আর গজেন্দ্র নির্বিকার। দমদম গেটের কাছে গাড়িটার সামনে কয়েকটা ভেড়া পড়েছিলো। জিপটা একটা লাফ দিয়েই, বলা চলে, ভেড়াগুলোকে কাটাতে গিয়ে প্রায় উল্টে যেতে যেতে (সামনে ছুটো রিক্সো) কি এক কায়দায় বাঁ পাশের তুই চাকার উপরে ভর করে বেরিয়ে গিয়ে প্রায় উড়তে উড়তে মধ্যমগ্রাম। কি ছুর্মতি হলো কপিলদেওর, সামনের ড্রেনটা কোনাকুনি কাটাতে গিয়ে একটা দেবদারু গাছের গায়ে ধাক্কা লাগালো। এক ঝটকায় জিপটা প্রায় চিৎ তবু চিৎ নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য, কোনো কথা নেই, তবু একটা অস্ফুট চীৎকার পর্যন্ত নেই পেছনে। যেন কেউ বসে নেই ওখানে। পাঁড়ে অস্থির হয়ে উঠলো। পাগলের মত চালাতে লাগলো এইবার। ঘণ্টায় আশি মাইল তুলে দিয়ে পর মুহূর্তেই ব্রেক কষে, ঘ্যা ঘ্যাঁ ঘ্যাঁ ঘ্যাঁচ। পেছনের চাকা ছুটো প্রায় লম্বের মত উঠে যাচ্ছে। কিন্তু তবু ব্রজেন্দ্রমোহন আর গজেন্দ্রের মুখ থেকে একটা শব্দ বের করতে পারলো না।

গাড়ি বনগাঁ পৌঁছলে কপিলদেও গাড়ি থামিয়ে বাঁ হাত দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে ডান হাত দিয়ে মানিব্যাগ বের করলো, গুণে গুণে দিলো দেড়শো টাকা।

'আপ জিপ গিয়া সাবাস!' একটু শুষ্ক অভিনন্দনও জানালো।

পেছনের সিট থেকে হাতে টাকাটা নিতে নিতে ব্রজেন্দ্র

বললো 'আর জিত গিয়া, হেরেই যাচ্ছিলুম আর কি। গুমা ব্রিজের উপরে সেই জার্কিংটা যখন দিলে, গজেন যখন খালের মধ্যে পড়ে গেলো, প্রায় চেঁচিয়েই উঠেছিলুম আর কি!

সবশুনে কপিলদেও তাজ্জব, 'কেয়া গজেনবাবু গির গিয়া, আপ কেঁউ নেই বোলা?'

'বলি আর বাজিটা হারি আর কি?' যেন কিছুই হয়নি ব্রজেন্দ্রমোহনের নির্বিকার কণ্ঠ শোনা যায়।

গুমা খালের পাশে একটা বাবলা গাছের নীচে বসে রৌদ্রে জামা শুকোচ্ছে গজেন, সেও দাদার মতন নির্বিকার দেখা গেলো, ফেরার পথে নিজেই উঠে বসলো। কপিলদেও পাঁড়ের শিক্ষা হলো বটে কিন্তু সে ব্রজেন্দ্রমোহন ব্রাদার্সের অনুরাগী হয়ে উঠলো।

এ কাহিনী এখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু বাজি ব্রজেন্দ্রও একবার হেরেছিলো। সেই গল্প না বলে কাহিনী শেষ করা উচিত হবে না।

ব্রজেন্দ্র মাদ্রাজ যাচ্ছিলো ট্রেনে। ট্রেনেই প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে আলাপ, অল্প অল্প কথাবার্তা চলছে।

হঠাৎ কথা উঠলো, 'মাদ্রাজ যে যাচ্ছেন, আসলে তো ওটা ভুল, মাদ্রাজ হবে না, বলা উচিত মাঁদ্রাজ। ওপরে একটা চন্দ্রবিন্দু দিয়ে চাঁদের মত উচ্চারণ করতে হবে।'

এই আলোচনায় ব্রজেন্দ্র অত্যন্ত মুখর হয়ে ওঠে 'মাদ্রাজ চিরকালই মাদ্রাজ। ন কিংম্বা চন্দ্রবিন্দু কোথাও কিছু নেই আপনি যাতা কথা বলছেন।'

প্রতিদ্বন্দ্বী জানায়, 'না ইংরেজদের জন্যে মাদ্রাজ উচ্চারণ আমরা ভুল শিখেছি আসলে মাঁদ্রাজ। ওরাই উচ্চারণগুলো নষ্ট করেছে। কলকাতাকে করেছে ক্যালকাটা, মাঁদ্রাজকে— মাদ্রাজ।' এই যুক্তিতে ব্রজেন্দ্র সায় দিতে পারেনা। ঠিক

আছে বাজি, বাজি দশ টাকা। মাদ্রাজ স্টেশনে নেমে একজন বাঙালীকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবে সে যা বলবে তাই মেনে নেয়া হবে।

ট্রেন থামলো মাদ্রাজে। বাঙালী ভদ্রলোক পাওয়া গেলো একজন। তাঁকেই ব্রজেন্দ্র জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা দেখুন, আমরা এখানে নতুন এসেছি। মাদ্রাজের আসল উচ্চারণটা কি, ঠিক উচ্চারণ মাদ্রাজ, না মাঁদ্রাজ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাঁদ্রাজ।'

ব্রজেন্দ্রের মাথায় বজ্রাঘাত।

'দিন আমার বাজির টাকা দিন!' টাকা নিয়েই দ্রুত পায়ে হাঁটতে সুরু করেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদিকে পরাজিত ব্রজেন্দ্রও আস্তে আস্তে ভদ্রলোকটির সঙ্গে স্টেশনের বাইরে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সংশয় তখনো যায়নি। এতদিনের একটা ধারণা, চিরকাল মাদ্রাজ শুনে এসেছি, মাঁদ্রাজ কি করে হল? শেষে আর সামলাতে না পেরে প্রায় লোকটার কাঁধের ওপর মুখ এনে ষড়যন্ত্রকারীর মতো ফিসফিস করে জানতে চায় ব্রজেন্দ্র।

'আচ্ছা, আপান কদিন হলো মাদ্রাজে এসেছেন?' ভদ্রলোককে এই তার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'মাঁত্র, মাঁসখাঁনেক।' দ্বিতীয়বার মুখ খুললেন ভদ্রলোক।

আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পেছনে ঝুঁকে পড়ল ব্রজেন্দ্র। ভিড়ের মধ্যে পকেটমার ধরার মতো করে হাতও বাড়িয়েছিল। উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'দিন, টাকা ফেরত দিন আমার!'

কিন্তু কোথায় সেই ভদ্রলোক। তার বদলে ব্রজেন্দ্রমোহন তখন একটা বেওয়ারিশ ষাঁড়ের লেজ প্রাণপণে চেপে ধরেছে।

হোলির দিনে
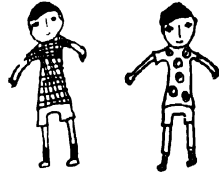
এক সময় যখন আমি কালীঘাটে থাকতাম, রান্না করার ব্যবস্থা ছিলনা বাড়িতে। আমি একাই থাকতাম, খাওয়াদাওয়া করতাম বাইরে হোটেলে, রেঁস্তোরায়।

হরতালের দিনগুলিতে যখন হোটেল রেষ্টুরেণ্ট বন্ধ থাকতো তখন খুবই অসুবিধা হত। আর অসুবিধা হত দোলের সময়টায়। হোলের দিন বেলা চারটে পর্যন্ত-ট্রাম-বাস, দোকান-পাট সব বন্ধ। খাবো কোথায়?

আমার এক আত্মীয় থাকতেন লালবাজার ষ্ট্রীটে। যদি কোনোরকমে তাঁর ওখানে পোঁছানো যায় তবে খাওয়ার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সেই লালবাজার পর্যন্ত যাওয়ার উপায় কি?

প্রথমতঃ বাসট্রাম নেই। ট্যাক্সিও পাওয়া সম্ভব নয়। যেতে হলে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। আর যাওয়া যায় সাইকেলে। একবার তাই গিয়েছিলাম। আমার নিজের কোনো সাইকেল নেই, পাড়ার এক বন্ধুর কাছ থেকে ধার করে। কিন্তু পথের মধ্যে এলগিন রোড আর চৌরঙ্গী রোডের মোড়ের কাছে কতকগুলো 'রামা হো', 'হোলি হো' হিন্দুস্থানী সাইকেল শুদ্ধ আমাকে আটকিয়ে নামিয়ে ফেললো। তারপর পর্যাপ্ত রঙ

মাখালো আমাকে এবং ঐ অবোধ সাইকেলটিকে। একেবারে আগাপাশতলা হাজার রঙে চুবিয়ে দিলো।

সে যে কত রকমের রঙ, কত রকমের গোলমেলে গন্ধ। আজ সাত বছর সাবান মেখেও তার সব রঙ আমার শরীর থেকে ওঠেনি, আমার কানের নিচে যে অস্পষ্ট লাল রঙের ছোপ রয়েছে, যাকে কেউ কেউ আঁচিল বলেন ভুল করে, সেই ছোপটা সাত বছর আগে আমার শরীরে ছিল না। ঐ হোলির দিন আমার শরীরস্থ হয়েছে, আজো সঙ্গত্যাগ করেনি।

সে যা হোক। আমার গায়ে রঙ লাগা নিয়ে আমার তেমন কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু আমার দুঃখ সেই সাইকেলটা নিয়ে। সেই সাইকেলটা তারপরে এমন বর্ণবহুল বিচিত্র হয়ে গেল যে বহু চেষ্টা করেও সেই সব রঙ ওঠানো গেল না।

আমার বন্ধুটি ঐ বহুবর্ণ সাইকেলটি কিছুতেই ফেরত নিতে রাজী হলো না, পৌনে তিনশো টাকা খরচ করে তাকে একটা নতুন সাইকেল কিনে দিতে হলো।

সাইকেলটা আমার নিজেরও খুব কাজে লাগলো না। ঐ রঙীন সাইকেল যার টায়ার হলুদ রঙের, সিট নীল আর বেগুনিতে মেশানো, লাল টুকটুকে হ্যাণ্ডেল এবং পিছনের মাডগার্ড খয়েরি রঙের, সেই সাইকেল চড়ে বসলেই পাড়ার বাচ্চা ছেলেরা আমার পিছে পিছে দৌড়তো আর কুকুর তাড়া করতো। একবার ফুটপাথ থেকে একটা ষাঁড় পর্যন্ত ঐ বিচিত্রদর্শন দ্বিচক্রযানটি দেখে উত্তেজিত হয়ে ছুটে এসেছিল।

বাধ্য হয়ে সাইকেল চড়ায় আমায় ক্ষান্ত দিতে হয়েছিল। সেই রঙীন বাহনটি আজো আমার ভাঙা বাড়ির এক তলায় সিঁড়ির নিচে পড়ে রয়েছে।

শুনেছি ম্যাজিক বা সার্কাসপার্টিতে এই ধরনের যানবাহন

প্রয়োজন পড়ে। তাঁরা যদি কেউ কখনো উৎসাহী হয়ে এই সাইকেলটির খোঁজে আসেন সেই দিনের আশায় আছি।

সুতরাং এরপর থেকে দোলের দিন সাইকেলে চড়ে যাওয়ার আর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর বাকি রইলো পায়ে হেঁটে যাওয়া। কিন্তু দোলের দিনে মানে চৈত্র মাসের গনগনে দুপুরে কলকাতার রাস্তায় পিচগলা রোদে, কালীঘাট থেকে লালবাজার অন্ততঃ পাঁচ মাইল রাস্তা হবে, ঐ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া সম্ভব আমার পক্ষে নয়। আর তাছাড়া পায়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ও তো ঐ 'রামা হো', 'হোলি হো'র ভয় রয়েছে পথের মধ্যে। আর যে একবার 'রামা হো', 'হোলি হো'র পাল্লায় ভুগেছে তার দুঃস্বপ্নেও সাহস হবে না আরেকবার তার মুখোমুখি হতে।

কিন্তু দোলের দিন দুপুরে তো আর তাই বলে আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না! যেভাবেই হোক আমাকে খাবার সংগ্রহ করতে হবে। এবং এটাও জানি যে কোনোরকমে লালবাজার পৌঁছতে পারি যদি তাহলেই খাওয়া হবে।

পরপর দুই বছরের অনাহারের পর তৃতীয় বছরে আমার বুদ্ধি কিছুটা খুললো।

দোলের দিন দুপুরবেলায় ভালো করে স্নান করে, মাথা আঁচড়িয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে রাস্তায় চলে এলাম। হাতে একটা ফাঁকা পিচকিরি। খবরের কাগজ দিয়ে জড়ালুম, যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে। তখন রাস্তায় রঙের খেলায় উৎসাহে ভাঁটা পড়ে এসেছে, তবু হাতে পিচকিরি দেখলে, তারা তখন রঙের খেলা শেষ করে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিলো তারা হয়তো ছাড়তো না, তাই পিচকারিটা জড়িয়ে নিয়েছিলাম। ধোপদুরস্ত জামা কাপড় আর স্নান করা চেহারা দেখে পাড়ার দোল খেলোয়াড়েরা আর বিশেষ কিছু বললো না।

আমি বড় রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। একটু দূরে একটা পুলিশের কালো গাড়ি আসছিলো। যাকে বলে প্রিজন-ভ্যান, যেগুলো এই দোলের দিন কলকাতার পথে বেরোয় এবং যারা রঙ নিয়ে বেশি মাতামাতি করে তাদের ধরে।

গ্যাড়িটা হাজরার মোড়ে এসে দাঁড়াতেই আমি গুটি গুটি গাড়িটার কাছে এগিয়ে গেলাম। এবং খবরের কাগজের খোলস খুলে ফেলে হাতের পিচকারি বাগিয়ে ধরলাম ঐ পুলিশ ভ্যানের ড্রাইভারের দিক, যেন রঙ দিতে যাচ্ছি।

আর দেখতে হলো না।

গাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে 'পাকড়ো, পাকড়ো,' বলে চীৎকার করে ছুটো মস্ত গোঁফওয়ালা সেপাই ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটতে লাগলো আমার দিকে। এবার আমারও ছোটা উচিত না ছুটলে সন্দেহ হতে পারে। সুতরাং আমিও দৌড় দিলাম এবং ঐ দুপুরের রৌদ্রে বেশীক্ষণ দৌড়ানো সম্ভব নয় বলে অনতিবিলম্বেই ধরা দিলাম।

সেপাই দুজন আমাকে জাপটে ধরে সেই কালো প্রিজন-ভ্যানে নিয়ে তুললো। তারপর গাড়ি রওনা হলো। সোজা লালবাজার।

লালবাজার গিয়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামানো মাত্র আমি যেন কিছুই ঘটেনি এমন মুখভাব করে লালবাজার কম্পাউণ্ড থেকে আমার আত্মীয়ের বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

'হাঁ, হাঁ' করতে করতে ছুটে এলো সেপাইরা, 'কাঁহা ভাগতা হ্যায়' তারা আমাকে জোর একটা গলাধাক্কা দিলো।

আমি আর কি করবো, অত্যন্ত বিনীতভাবে অনুরোধ করলাম, 'তুমকো বড়বাবুকা পাশ হামকো লে যাও, দয়া করকে।'

খুব করুণ স্বরে বললাম এই 'দয়া করকে' কথাটা, সেপাইদের

শুনে বোধ হয় সত্যিই দয়া হলো। তারা কি ভেবে আমাকে তাদের বড়বাবুর কাছেই নিয়ে গেলো।

ভাগ্য ভালো, বড়বাবু বাঙালী। তাঁকে সব বোঝালাম, 'দেখুন স্যার, আমার মত স্নান করে স্যার, ফর্সা জামা কাপড় পরে স্যার, কেউ দোল খেলতে যায় না স্যার। আমার পিচকারিও রঙ ছাড়া স্যার, ফাঁকা পিচকিরি দিয়ে স্যার, কি করে রঙ দেবো, স্যার? আর তা ছাড়া, স্যার, পাগল নই আমি যে স্যার, পুলিশের গাড়ির ড্রাইভারের গায়ে স্যার, রঙ রঙ দিতে যাবো, স্যার।'

সব শুনে বড়বাবু বললেন, 'সে তো বুঝলাম, তাহলে আপনি রঙ খেলতে বেরিয়েছেন কেন?'

'আমি তো রঙ খেলতে বেরোইনি, স্যার।' আমি উত্তরে জানালাম, 'স্যার, আমি আসলে স্যার, বেরিয়েছি নিমন্ত্রণ খেতে।'

'নিমন্ত্রণ খেতে?' পুলিশের বড়বাবু রীতিমত অবাক।

আমি আঙুল দিয়ে কম্পাউণ্ডের বাইরে রাস্তার ওপারে একটা বাড়ির দোতলা দেখিয়ে বললাম, 'ঐখানে স্যার, আমার নিমন্ত্রণ, স্যার। দোলের দিনে স্যার, কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই স্যার, কিভাবে আসবো বলুন, স্যার, এই কায়দায় পুলিশের গাড়িতে চড়ে স্যার, আসতে হলো স্যার।'

বড়বাবু অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আর আমি ধীরে ধীরে হেঁটে আমার আত্মীয়ের বাড়ির দিকে রওনা হলাম। সেপাইরা কেউ কোনো বাধা দিলো না। আর কি করেই বা বাধা দেবে? তারা নিজেরাই তখন মাদল বাজিয়ে, আবির ছিটিয়ে 'রামা' হো', 'হোলি হো' করে লাফাচ্ছে।

দুর্লভ কাহিনী
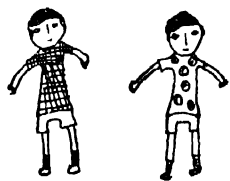
শ্রীযুক্ত বাবু দুর্লভনারায়ণ সিংহ চৌধুরী মহোদয়ের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল এক বিবাহ-বাসরে ; নিরীহ-মিনমিনে গোছের ভদ্রলোক, গলায় পাকানো চাদর জড়িয়ে বরযাত্রীদের একদিকে দেয়াল ঘেঁষে বসে রয়েছেন। রীতিমত রোগা, যাকে বলে হাড়গিলে চেহারা শুধু চোখদুটো অসম্ভব উজ্জ্বল, দেখলে মনে হয় অন্ধকারে বিড়ালের মতো ঝকঝক করে জ্বলবে ও দুটো।

প্রথমে ভদ্রলোককে ভীষণ মিতবাক বলে ভ্রম হতে পারে আপনার ; আস্তে আস্তে চুপচাপ বসে একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছেন, এরই মধ্যে হঠাৎ কখন ঠোঁটটা থিরথির করে কেঁপে উঠল সিগারেটটা পৌরাণিক ঝুলন্ত সেতুর মতো ঠোঁটের ফাঁকে দুলে দুলে নড়তে লাগল, কেউ যেন সুইচ টিপে দিল ; এতক্ষণের বন্ধ কথার স্রোত কি করে শতমুখী সহস্রধারায় উদ্বেল হয়ে উঠল। একটা করে বাক্য সম্পূর্ণ করেন দুর্লভ আর একবার কাঁধে ঝাঁকি দেন ; শেষের দিকে এমন হয় যে মিনিটে দশবারো বার কাঁধে ঝাঁকি দিচ্ছেন দুর্লভ অনর্গল কথার প্লাবনে সবকিছু ভেসে যাচ্ছে।

সব বাক্য সম্পূর্ণ নয়, সব কথা স্পষ্ট করে বোঝাও যায়.

না। তিনি ঠিক কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেন তাও বলা চলে না। চারিদিকে যত লোকই থাকনা কেন তিনি কারুর দিকে না তাকিয়ে তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের ঠিক ডগায় একটা বড়ো কালো মতন কড়া আছে সেটার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে যেন সেই কড়াটার সঙ্গে কথা বলে যান। অবশ্য সেটা একদিকে থেকে তাঁর প্রয়োজনও বটে; সবাক শ্রোতা তাঁর দুচোখের বিষ: শ্রোতা শুধুই শুনবে সে যেন কথার মধ্যে কোন উচ্চবাচ্য না করে। তিনি গল্পের হাতী যতক্ষণ সাধ যায় লুফে যাবেন কেউ যেন বাধা সৃষ্টি না করে।

পানে চূণ বেশী হয়েছে যেন কার, তার মুখ পুড়ে গেছে। ভদ্রলোক ভীষণ উত্তেজিত, একটু পরেই ভুরিভোজ, এরই মধ্যে যদি জিভটা পুড়ে যায়—বিবাহ বাসরে একটা সোর-গোল পড়ে গেল। যার মুখ পুড়েছে তিনি ভীষণ ইম্পর্টান্ট, যার বিয়ে হচ্ছে সেই পাত্রের আপন মামা, সুতরাং একটু গোলমাল হবেই। দুর্লভ একপ্রান্তে বসে এতক্ষণ সোর-গোলটা অনুধাবন করছিলেন, হঠাৎ কাঁধে এক ঝাঁকি দিয়ে বললেন, 'হনুমান'।

এই ধরনের আকস্মিক উক্তিতে সবাই বিস্মিত এবং বিব্রত বোধ করলেন। দুর্লভ পায়ের কড়াটার দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'লঙ্কার হনুমানের মুখ পুড়ে গিয়েছিল।'

যার মুখ পুড়ে গিয়েছিল তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন, 'মানে?' দুর্লভ একটু বেশী করে ঠেস্ দিয়ে বসলেন, তারপর যোগ করলেন, 'রাক্ষসীরা বোধ হয় পানে চূণ বেশী দিয়েছিল।'

এই মন্তব্য, বিশেষ করে এই বিশ্লেষণী শক্তি ভদ্রলোকের প্রতি আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করে ফেলল।

আমি ধীরে ধীরে একটু একটু করে তাঁর পাশ ঘেঁষে

এসে বসে পড়লাম। তিনি একবার ভ্রূকুঞ্চন করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বিশেষ যেন পাত্তাই দিলেন না। আমার তাতে কিছু আসে যায় না, গুণমুগ্ধ ভক্ত কবে গুরু-দেবের করুণার জন্য অপেক্ষা করেছে?

ইতিমধ্যে আবার আলোচনা সুরু হয়েছে। অবশ্য দুর্লভ তাতে যোগ দেন নি; শুধু যতদূর মনে হল মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছেন। হঠাৎ কাঁধে একটা ঝাঁকি দিয়ে সুতো ধরলেন। পানে চূণ বেশি হওয়ার আলোচনা তখন থেমে গিয়েছিল, এবারে আলোচনার বিষয় যানবাহন। সবাই এ বিষয়ে একমত যে যানবাহনে, ট্রামবাসে এত ভিড় হয়েছে যে যাতায়াত করা এখন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে দেখা গেল নিজস্ব কিছু বক্তব্য রয়েছে।

ট্রামে এক বিদেশি সাহেবের সঙ্গে এক কণ্ডাকটরের কি ঝগড়া হয়েছিল তাই নিয়ে বেশ জমিয়ে গল্প করছিলেন এক ভদ্রলোক। দুর্লভ জোর করেই ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন গল্পটা, "ট্রাম", "সাহেব", অসংলগ্নভাবে এই রকম কয়েকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন পর পর কয়েকবার, তারপর সুরু হল সেই অনর্গল প্লাবন। পায়ের কড়াটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুর্লভ বলে চললেন; 'সেদিন ধর্মতলার মোড়ে সন্ধ্যাবেলা একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে, আমি ফলের দোকানগুলোর পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে ভিজছি, ঠিক ভিজছি না ভিজতে ভিজতে একটা ছবি দেখছি, কয়েকজন জাপানি ছেলেমেয়ে একটা হরিণের বাচ্চাকে স্নান করাচ্ছে, এই ছবিটা একটা বিলিতি সাহেবের জামায় আঁকা, সাহেবও আমার সঙ্গে ভিজছে।'

বলতে বলতে দুর্লভ ইতিমধ্যে সাতবার কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে নিলেন, 'আমিও ভিজছি, সেও ভিজছে।'

একবার সেকেণ্ড পঁচিশ ত্রিশ চুপ, ঠিক চুপ নয় ঠোঁট দুটো থিরথির করে কাঁপছে এরই মধ্যে আরেকবার কাঁধে ঝাঁকুনি বেশ জোরে, বোধহয় মনে মনে একটা লম্বা সেণ্টেন্স শেষ করলেন; 'তারপর আমি যাব রাজাবাজারে, বলরামের ছোট মেয়েকে দেখতে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কি ভীষণ ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে আজকাল, একটা ট্রাম এলো, কি ভীষণ ভীড়, দাঁড়িয়ে রয়েছি, আমিও, সেও, আমিও ভিজছি সেও ভিজছে।'

হঠাৎ গল্পের তোড় ঘুরিয়ে দিয়ে দুর্লভ প্রশ্ন করলেন 'ইনফ্লুয়েঞ্জা কেন হয় আপনারা কেউ জানেন?' দুর্লভ পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে নিজেকেই প্রশ্ন করলেন বলে বোধ হল। সুতরাং কেউই এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। আমার কি হল, আমি একটু বোকা কিংবা দুঃসাহসী বলেই হয়ত বলে বসলাম, 'বোধ হয় ঠাণ্ডা গরমের গোলমালে।'

দুর্লভ এমনভাবে ভ্রূকুঞ্চন করে তাঁর পায়ের কড়াটার দিকে, আমার দিকে নয়, তাকালেন যে বোঝা গেল এ ধরনের ভুল কথা তিনি মোটেই সহ্য করতে রাজী নন। কাঁধে রীতিমত বড় একটা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে বললেন, 'কাঁচা চামড়ার জুতো থেকে হয়।' কেউ কিছু প্রশ্ন করার আগেই বলে চললেন, 'কাঁচা চামড়ার মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার জীবাণুর বাসা থাকে। আজকাল যা সবারই পায়ে মসমস করছে সব কাঁচা চামড়ার জুতো। শখ করে জুতো পায়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই সখেরই ফল ভোগ করতে হচ্ছে ইন-ফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে ভুগে।'

কিন্তু সেই ট্রাম আর সাহেবের কি হল? ইনফ্লুয়েঞ্জা

আর কাঁচা চামড়ার এরকম নিকট সম্পর্ক আবিষ্কারে যারা বিচলিত হননি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে তাঁরা যথেষ্ট অধৈর্য হয়ে পড়েছিলেন সেই ট্রাম সাহেবের কি হল জানবার জন্যে।

আমিই দ্বিতীয়বার সাহস দেখিয়ে স্মরণ করিয়ে দিলাম মূল গল্পের সূত্রটা। কিন্তু দুর্লভবাবু যেন ধরতেই পারেন নি, অনেক বোঝানোর চেষ্টা করার পরে তিনি বললেন, 'ও সেই ধর্মতলার মোড়ে। কিন্তু তার নাম আমি জানবো কি করে ?'

'আজ্ঞে না, তার নামের কথা নয় তারপরের ঘটনাটা কি হলো ?' আমার এই বিনীত জিজ্ঞাসায় তিনি কাঁধে ঝাঁকি দিলেন আরো একবার, তারপর বললেন, 'ও ঘটনা, তা ঘটনাটা—'

'আরও একটা ট্রাম এলো, সেই রকম ভিড়, সাহেবটাও বোধ হয় ঐ দিকে যাবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপায়ে, আমার দুই, সাহেবের দুই, বাত হয়ে গেলো। সে আমার দিকে ঘুরে তাকাল, আরেকটা ট্রাম, আরেকবার তাকাল, আমি গলার চাদরটা—।.....

এই সময় হঠাৎ বিরতি, ঠোঁটে থির থির করে কাঁপুনি, তারপর আবার শুরু।

'গলার চাদরটা আরো একটু পাকিয়ে নিলাম, পকেট থেকে চিরুণি বার কবে মাথাটা আঁচড়ে নিলাম, সাহেবটা একবার তাকিয়ে দেখল। আমি ফিক্ করে একটু হাসলাম, সে হাসল না, আরেকটা ট্রাম এলো।

'এই ট্রামটা একটু ফাঁকা, মানে একটু ভিড় কম, আমি লাফিয়ে উঠে পড়লাম, সে এখনো দাঁড়িয়ে, ট্রামের পাদানিতে ঝুলতে ঝুলতে পিছন দিকে মাথা ঘুরিয়ে, দেখলাম। সাহেবটা অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে। একদম ভিজে গেছে; হরিণের

বাচ্চাশুদ্ধ জাপানিদের ছবিটা কেমন ভেজা ভেজা, এখনো দাঁড়িয়ে, ট্রামটা আরেকটু দূরে চলে যেতে আর দেখা গেলো না।'

তিনবার পর পর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে দুর্লভ থামলেন।

'তারপর?' কে যেন জিজ্ঞাসা করল বরযাত্রীদের মধ্য থেকে।'

'তারপর, রাজাবাজার গিয়ে দেখি বলরামের ছোট মেয়েটার জ্বর তখনও সারেনি।' দুর্লভ সিগারেট ধরালেন।

একজন বাধা দিয়ে উঠল, 'না, না, বলরামবাবুর মেয়ের সেই কথা বলছি না, সাহেবের ব্যাপার কি হল?'

'ব্যাপার আর কি? আপনারাও যে রকম, আমি কি জানি। আমি তো রাজাবাজার চলে গেলাম, আমি কি আপনাদের মত নাকি?' বেশ ধমকের স্বরে কথা শেষ করে নির্বিকার দুর্লভ সিগারেট টেনে চললেন।

দুর্লভের সঙ্গে আমার আর একবার দেখা হয়েছিল এক বাসের মধ্যে। আমরা দুজনেই হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বলা বাহুল্য উনি আমাকে চিনতে পারেন নি, অবশ্য চিনতে পারার কথাও নয়। যে বাসটায় যাচ্ছিলাম সেটা অতি সামান্যের জন্য একটা দুর্ঘটনা এড়িয়ে গেল, উল্টোদিক থেকে আসা একটা ট্রামের উপর প্রায় উঠে যাচ্ছিল, কোনক্রমে পাস কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। এই নিয়ে বাসের মধ্যে বিশেষ একটা সোরগোল। একটু পরেই যখন সোরগোল একটু কমে এল দুর্লভ দখল করে নিলেন আলোচনার সমস্ত অংশটুকু। সেই কাঁধে ঝাঁকি, সেই ভ্রুকুঞ্চন কেবল তফাৎ এই বাসের ভিড়ের মধ্যে পায়ের কড়ার দিকে তাকাতে পাচ্ছেন না! দুর্লভ বললেন, 'অধিকাংশ দুর্ঘটনার মূল কারণ কাঁচের অভাব।' সবাই যথেষ্ট অবাক হয়ে গেলেন। দুর্লভ বললেন, 'এই যে ড্রাইভাররা

যে সামনের জানলার কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকায় ওটা কি আসল কাঁচ?' দুর্লভের এই প্রশ্নের উত্তর কেউই দিতে পারলনা। আমি বললাম, 'ওটা গ্যাটাপার্চার বোধহয়।' ঠোঁট দুটো থির থির করে উঠল, 'গ্যাটাপার্চারের মধ্যে দিয়ে দেখতে হয় বলে চোখে চাপ পড়ে, নার্ভের কণ্ট্রোল থাকে না, হাতের কব্জির জোর কমে যায়, ড্রাইভাররা ঠিক সময়ে ব্রেক কষতে পারে না, এ্যাক্সিডেন্ট করে বসে।'

ঠিক এই মুহূর্তে প্রচণ্ড ব্রেক কষে বাসটা এক লাফে ফুট-পাথের উপর উঠে গেল। 'ওরে বাপরে' বলে দুর্লভ আমাকে জাপটিয়ে ধরে ধুলোর উপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন, তাঁর ঠোঁটে থির থির করে কাঁপুনি, আমিও তাঁকে জড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম।

পরোপকারী গোকুলনারায়ণ
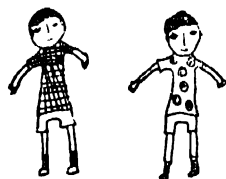
এক মুহূর্ত নিঃশ্বাস ফেলার সময় পায় না আমাদের গোকুল-নারায়ণ। গোকুলনারায়ণের প্রধান ত্রুটি সে যে পরোপকারী তা সকলেই জেনে গেছে। তার দায়িত্ব-পরায়ণতা সম্পর্কে আপন-পর সকলেই এখন নিঃসন্দেহ।

আমার ছোটপিসিমার কানের অপারেশন হবে। গোকুলকে জিজ্ঞাসা করলাম কি করা যায়? গোকুল বললো, কোনো ভাবনা নেই, কলকাতার সবচেয়ে নামজাদা কর্ণচিকিৎসক তার বিশেষ পরিচিত। সত্যিই তাই. খুব যত্ন নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে পিসিমাকে সারিয়ে তুললেন, এখন তিনি আবার নিন্দা-প্রশংসা সবই সমানভাবে শুনতে পাচ্ছেন। কিন্তু গোকুলকে একটা কাজ করতে হলো—কানের ডাক্তারের এক খুড়তুতো ভাই কোনো এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি হবে তার জন্যে জনৈক কর্তাব্যক্তির সুপারিশ একান্ত প্রয়োজন। গোকুল এককথাতেই রাজী হয়ে গেলো। এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে তার মেজোমামার খুবই ঘনিষ্ঠতা আছে। মেজমামার মার-ফতেই তাঁকে যোগাযোগ করলো গোকুল। মেজোমামা গোকুলকে বললেন, 'তুই আজকাল একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছিস্। প্রয়োজন না পড়লে তোর দেখাই পাওয়া যায় না।

চেতলায় বাড়িটা কিছুতেই সম্পূর্ণ করতে পারছি না, শুনলাম বারাসতের ওদিকে কোথায় এক নম্বর ইঁট নব্বই টাকা হাজার বেচছে, তুই একদিন গিয়ে খোঁজ নিয়ে আয় তো।'

বৈশাখ মাসের দুপুরে পাকা চার ঘণ্টা ইঁটখোলায় গনগনে আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইঁটের লরির উপরে বসে বারাসত থেকে পনেরো দিনের মধ্যে চেতলায় পাঁচ লরি ইঁট এনে ফেললো গোকুল! এরই মধ্যে সময় করে মেজোমামার চিঠি নিয়ে সেই কর্তাব্যক্তির সঙ্গে দেখা করলো গোকুল। সব শুনে তিনি বললেন, 'এ আর বেশী কথা কি? আর আপনি যখন অমুকের ভাগ্নে এতো সামান্য অনুরোধ। ঠিক আছে হয়ে যাবে। আপনি সামনের রোববার সন্ধ্যার দিকে একবার আসুন।'

পরের রোববার সন্ধ্যায় গোকুলের তাসখেলায় ব্রিজ কম্পিটিশনের সেমিফাইন্যাল ছিলো। সেমিফাইন্যালে উঠে তবু ওয়াকওভার দিতে হলো গোকুলকে, যথাসময়ে কর্তা-ব্যক্তির বাড়িতে পৌঁছে জানলো তিনি বিশেষ কাজে কলকাতার বাইরে চলে গেছেন ফিরবেন সামনের বুধবার।

বুধবার দিনও গোকুল গেলো, শুনলো সামনের শুক্রবার, শুক্রবার দিন গিয়ে জানলো পরের দিন সকালে তিনি ফিরছেন। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তির তারিখ প্রায় পার হয়ে যাচ্ছে, সেই কানের ডাক্তার বারবার লোক দিয়ে, চিঠি দিয়ে, ফোন করে তাগাদা দিচ্ছেন, 'কি হলো?'

শনিবার সকালে হলো না, রাত্রে দেখা হলো কর্তাব্যক্তিটির সঙ্গে। ভয়ঙ্কর সদাব্যস্ত পুরুষ, গোকুলকে আবার সব খুলে বলতে হলো, মেজোমামার নাম বলতে হলো, আত্মপরিচয় দিতে হলো, তখন তাঁর স্মরণ হলো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা ভর্তির

তারিখ এখনো চলে যায়নি।' গোকুল বিনীতভাবে জানালো 'আর মাত্র দুদিন আছে।'

'আচ্ছা দেখছি।' ভদ্রলোক ফোন তুলে কার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কিসব বিষয়ে আলোচনা করলেন, গোকুল টুকরো টুকরো শুনলো, 'হ্যাঁ, ঠাণ্ডা···, সর্দিজ্বর,···খুব হচ্ছে, আমাদের দারোয়ান, হিন্দুস্থানীদেরও ইনফ্লুয়েঞ্জা, কি ভীষণ গরম, আবহাওয়া অফিসের থার্মমিটার ··. একেবারে পুরানো ···' তারপর কথাবার্তা শেষ করে ভদ্রলোক গোকুলকে বললেন, 'আজ আর ওকে কিছু বলা গেলো না। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, আহা বেচারী, ব্যাচেলার মানুষ।'

ইনফ্লুয়েঞ্জা-কাতর এই ব্যাচেলরটির জন্যে পরোপকারী গোকুলের মনেও একটু সমবেদনা দেখা দিলো না তা নয়, তবে তখন তার আশু প্রয়োজন কানের ডাক্তারের খুড়তুতো ভাইয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করা। সে উঠতে উঠতে বললো, তা হলে, কিছু করা গেলো না।' আর ভাবতে লাগলো কাকে এ বিষয়ে এরপরে ধরা যায়।

ভদ্রলোক গোকুলের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি ভবানীপুরের দিকে থাকেন না?' গোকুল ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'ঠিক ভবানীপুরে নয়, ভবানীপুর আর কালীঘাটের মাঝামাঝি।'

'হাজরা রোডের দিকে বোধ হয়?' ভদ্রলোকের প্রশ্নের উত্তরে গোকুল স্বীকার করলো, 'হ্যাঁ তাই।'

'আচ্ছা আপনাদের অঞ্চলে, একটা বাড়িভাড়া জোগাড় করে দিতে পারেন, শ-খানেক টাকা ভাড়ার মধ্যে···ইত্যাদি ভদ্রলোক কি সব বলে গেলেন, গোকুল চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলো। অনেক ঠেকে ঠেকে তার অভিজ্ঞতা হয়েছে, কলকাতা শহরে বাড়িভাড়া করে দেবো, এ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মতো

বোকামি আর নেই। গোকুল পরোপকারী কিন্তু বোকা নয়, 'আচ্ছা দেখবো', বলে নমস্কার করে বেরিয়ে এলো।

কানের ডাক্তারের খুড়তুতো ভাইকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তির আর মাত্র একদিন বাকি আছে। গোকুলদের বাড়ির উল্টোদিকে এক রিটায়ার্ড এঞ্জিনিয়ার থাকতেন গোকুল কোনো কিছু ভেবে না পেয়ে অবশেষে ভাবলো এই ভদ্র-লোকের যদি যোগাযোগ কিছু থাকে। যোগাযোগ আছে কিনা জানা গেলো না তবে ভদ্রলোক সেদিন সন্ধ্যাবেলা পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে গোকুলকে গীতার দশম অধ্যায় ব্যাখ্যা করে শোনালেন। তারপরে এই সাত্ত্বিক প্রকৃতির অবসরপ্রাপ্ত বাস্তুকার যখন প্রায় মধ্যরজনীতে 'প্রেম বড় না কাম বড়' বিষয়ে একটি সরস আলোচনা শুরু করলেন গোকুল বিনা বাক্যব্যয়ে রণে ভঙ্গ দিলো। 'কি হলো গোকুলবাবু?' বলতে বলতে ভদ্রলোক গোকুলের পিছু পিছু অনেকটা এসেছিলেন কিন্তু গোকুলের তখন মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে নিজের উদ্দেশ্যের কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে।

বর্তমানে সেই কর্ণবিশারদ গোকুলকে 'লায়ার' এবং 'ইর্‌রেসপন্সিবল্' বলে বেড়াচ্ছেন, তদুপরি কর্তাব্যক্তিটির বাড়িভাড়ার ব্যাপারে গোকুলের উৎসাহের অভাব বিশেষ পছন্দ হয়নি। তিনি গোকুলের মামার কাছে অনুযোগ করেছেন 'আপনার ভাগ্নেটি একটা একেবারে ক্যাড্।'

সেদিন গোকুলের সঙ্গে দেখা হলো। কালীঘাট পার্কের পাশের দিকে উঠোনওলা বাড়ির মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। গৃহস্থের অন্দরমহলে উঁকি দেবার মতো চরিত্র গোকুলের নয়। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার গোকুল?' গোকুল আমাকে দেখে ব্যাকুলভাবে বললো, 'আচ্ছা কচি ডুমুরপাতা পাই কোথায় কলকাতা শহরে, বলতে

পারো ?' ডুমুরফুলই শুধু দুর্লভ তায়, ডুমুরপাতাও দুর্লভ, গোকুলকে ব্যাপারটা বোঝাতে বললো, 'ছোটপিসিমার শ্বশুরের ঘাড়ে ঘা হয়েছে, কোবরেজ বলেছে কচি ডুমুরপাতা বেটে লাগাতে। দাঁড়াও, ঐ বাড়িটার উঠোনে একটা গাছ মতন দেখছি, দেখো তো ওটা ডুমুর গাছ কিনা ?'

জয়পুরের জরির নাগরা

মজুমদার সাহেব জয়পুর থেকে এক জোড়া জরির নাগরা কিনে এনেছেন। এমন বিচিত্র জুতো এর আগে দেখিনি। ঠিক দেখিনি বলা অনুচিত। থিয়েটারে দেখেছি, মিউজিয়মে দেখেছি, এমন কি চৌরঙ্গীতে কিউরিয়োর দোকানেও বোধহয় দেখেছি, কোনদিন পরিচিত অপরিচিত কোনো ভদ্রলোকেরই পদস্থ দেখিনি।

ক্রিম রঙ, তার উপরে নীল হলুদ এবং রূপালি জরির কাজ করা, মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো রঙীন কাঁচ বসানো। একটু হাঁটলে তিনরকম শব্দ বেরোয়। একটা শব্দ খুব ক্ষীণ কোনো কোনো দরজার পাল্লা বন্ধ করতে গেলে যে রকম শব্দ বেরোয় এই শব্দটা স্থায়ী, হাঁটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও কয়েক সেকেণ্ড পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শব্দটা তিন সেকেণ্ড পর পর চটাস চটাস ধরনের—কাঁচা বাঁশ ভাঙ্গা শব্দের মতো অনেকটা। তৃতীয় শব্দটির প্রকৃতি অবশ্য বোধগম্য হল না, কখনো পর পর কয়েকবার তারপর এক মিনিট চুপচাপ, কখনো প্রহৃত কুকুরের আর্তনাদের মতো, কখনো সদ্যজাত বিড়াল শাবকের কোপন ক্রন্দনের মতো। এই শব্দ-রহস্যটা অবশ্য পরে জেনেছিলাম।

এছাড়াও জুতোজোড়ার আরো একটি জিনিস বিশেষ

বর্ণনীয়। নাগরা জুতোর শুঁড় থাকে জানি কিন্তু এমন পল্লবিত লতার মতো সবুজ রঙের শুঁড় অকল্পনীয়। তাও দুইদিকে, জুতোর মাথায় এবং গোড়ালিতে। সব মিলে এমন একটা জিনিস হতে পারে তা না দেখলে বোঝানো অসম্ভব।

মজুমদার সাহেব জুতোজোড়া হাতে করে আমার ঘরে ঢুকলেন, খালি পা। বুঝলাম এই জোড়াই পায়ে ছিলো। কোনো কারণে হাতে নিয়েছেন। নতুন জুতো পায়ে ফোস্কা-টোস্কাও পড়তে পারে। তিনি কিন্তু যেসব কিছু বললেন না। প্রথমেই অভিযোগ আনলেন আমার বিরুদ্ধে. আপনার বাড়িতে আর আসা যাবে না মশায়, সিঁড়িটা যা নোংরা করে রেখেছেন।' এই বলে তারের ওপর থেকে আমার তোয়ালেটা মেঝেতে ফেলে তার উপরে জুতোজোড়া রাখলেন। তারপর খুবই গর্বিতভাবে জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নিয়ে এলুম জয়পুর থেকে. খিদমতোল্লা ঘরানার তৈরী শেষ জরির নাগরা, আর পাওয়া যাবে না। এ হলো সেই ধরনের জুতো যার একপাটিও চুরি যায়। এসব পায়ে দিয়ে কার্পেটের উপরে ছাড়া হাঁটাই উচিত নয়।'

মল্লিকমশায় আমার বিছানার একপ্রান্তে এতক্ষণ চিৎ হয়ে পড়েছিলেন, এবার উঠে বসে জুতোজোড়া নিরীক্ষণ করলেন তারপর প্রশ্ন করলেন, 'মজুমদার সাহেব, খিদমতোল্লা ঘরানার ব্যাপারটা কি?'

আমি আঁতকে উঠলাম। মজুমদার সাহেব একঘণ্টার মতো একটা বিষয় পেয়ে গেলেন। একঘণ্টা লাগলো না তিনি পঞ্চাশ মিনিট সময় নিলেন। মোগল বাদশারা কাবুল থেকে যে চর্মকার বংশ এনে জয়পুরে বসান তারই প্রথম পুরুষ খিদমতোল্লা। এই খিদমতোল্লা ঘরানার তৈরী জুতো ছাড়া তাঁরা পায়েই দিতেন না। এঁদের চামড়ার কাজ এতই শিল্পময়

ছিলো যে, শাজাহান নাকি একবার ভেবেছিলেন যে, তাজমহল শ্বেতপাথর দিয়ে না বানিয়ে চামড়া দিয়ে বানাবেন। পরে এত চামড়ার জন্যে দেশের পশু-সম্পদ একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে, মন্ত্রীদের এই পরামর্শে তিনি প্রস্তাব বাতিল করেন। এই ঘরানার শেষ বংশধর এ বছরই পরলোকগমন করেছেন এবং এই জুতোজোড়াই তাঁর শিল্প-কীর্তির শেষ নিদর্শন।

মল্লিকমশায় সব খুব গম্ভীরমুখে শুনলেন। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং করতে করতে বললেন, 'খুব ভালো জিনিসই মনে হচ্ছে। আপনার সঙ্গে আর কেউ গিয়েছিলো নাকি জয়পুরে?'

'আমার এক বন্ধু গিয়েছিলেন, কেন?' মজুমদার সাহেব উত্তরের মাথায় প্রশ্ন বসিয়ে দিলেন।

'তিনি ভালো আছেন?'

'কেন?' মজুমদার সাহেবের কণ্ঠস্বর কঠিন হলো।

'না, এই কেন, আর কি, জিনিসটা মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরী মনে হচ্ছে। কেমন একটা আকুল গন্ধ।'

মজুমদার সাহেব ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'আপনাদের সমস্ত ব্যাপারে ঈর্ষা, ঠাট্টা। একটা লোক একজোড়া পছন্দমত জুতো পর্যন্ত পায়ে দিলে আপনাদের চোখ টাটায়!'

আমার ঘরে একটা মারামারি হোক, এ আমি চাই না। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'আরে মশায় ঘরে বসে এখন সন্ধ্যাবেলা শুধু শুধু ঝগড়া, চলুন রাস্তায় বেরুনো যাক্।'

এই প্রস্তাবে মজুমদার সাহেব কেমন একেবারে কুঁকড়ে গেলেন, 'না এই ঘরেই বেশ ভালো, এখন আবার রাস্তায় হাঁটাহাটি—!'

আমি ছাড়লুম না, জোর করেই পথে বার করলাম বন্ধুদের।

মজুমদার সাহেব জুতোজোড়া হাতে করে ফুটপাথে এসে পায়ে দিলেন। কিন্তু তখনো আমরা মজুমদার সাহেবের আপত্তির কারণ বা ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পারিনি। পায়ে দিয়ে হাঁটামাত্র বিচিত্র শব্দমালা নির্গত হতে লাগলো। অবিলম্বে চতুর্দিকে কৌতূহলী পথচারী এবং প্রতিবাদ-পরায়ণ কুকুরমণ্ডলীর সম্মুখীন হতে হলো। এ বাধা হয়তো খুব বড় ছিল না, কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের ঘটনা ঘটলো। মিনিটখানেক হাঁটবার পরেই মজুমদার সাহেব একটা আর্ত-চীৎকার করে উঠলেন। আমরা প্রথমে ভাবলাম কোনো সাহসী কুকুর বোধ হয় কামড়ে দিয়েছে, কিন্তু তার আগেই আমাদের সামনে একজন ঝাল-মুড়িওয়ালা যাচ্ছিলো সে ফুটপাথ থেকে হাত-চারেক সামনে গড়িয়ে অল্পের জন্যে একটা গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলো। ঝালমুড়ির টিন মল্লিকমশায়ের মাথায় পড়লো। টিনের পাশ থেকে ছিটকে একটা তেলের শিশি এক টাকওয়ালা ভদ্রলোকের মাথায় পড়ে ভেঙে গেলো।

সমস্ত ব্যাপারটা মিটমাট করতে ঘণ্টাখানেক লাগলো। মজুমদার সাহেবকে ভীষণ লজ্জিত দেখাচ্ছিলো। তিনি একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'কি যে হোল পায়ের গোড়ালি থেকে কোমর পর্যন্ত, কিছু বোঝবার আগেই হাঁটুশুদ্ধ ডানপাটা এক সমকোণে ঘুরে গেলো।' আমরা আর সাহস পেলুম না। মজুমদার সাহেব সেদিনের মতো আমার চটিজোড়া পায়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। জরির নাগরাজোড়া আমি বাড়িতে নিয়ে এলাম।

ব্যাপারটা কি বুঝবার জন্যে আমি ঘরের মধ্যে জুতো-

জোড়া একবার পায়ে দিয়ে পরীক্ষা করলাম। কিছুই জানি না, বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। আজ বারোদিন শয্যাশায়ী, কোনো জুতো পায়ে দিলে যে হাঁটু ফুলে যেতে পারে আর দাঁতের ব্যথা হয় আগে জানতুম না।

বেগুনের বোঁটার হালুয়া
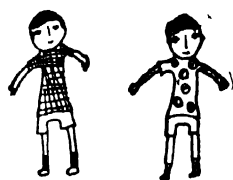
করুণাপিসি যে এমন অসামান্য রান্না করতে পারেন জীবনে কখনো ভাবিনি। খাবারটা কি দিয়ে তৈরি সেটা পর্যন্ত অনুমান করতে পারলুম না, কিন্তু অসাধারণ সুস্বাদু। কড়া জর্দা দিয়ে একটি পান খাওয়ার পরেও জিভে স্বাদ লেগে রইলো।

সুতরাং করুণাপিসি যখন স্বভাবতই জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হয়েছে, আমি বললাম, ওয়াণ্ডারফুল। তারপরে কিছুটা কৌতূহল আর কিছুটা ভদ্রতার খাতিরে জানতে চাইলাম, খাবারটা আসলে কি দিয়ে তৈরি? পিসি খুব রহস্যময়ী ভঙ্গিতে বললেন, অনুমান কর।

অনুমান করতে পারলে কি আর জানার জন্যে এত উৎসাহ দেখাতাম, আমি সবিনয়ে জানাতে করুণাপিসি বললেন, বেগুনের বোঁটা দিয়ে।

বেগুনের বোঁটা দিয়ে? আমি রীতিমত বোকা বনে গেলাম। ততক্ষণে পিসি একটা পুরনো ফ্ল্যাট ফাইল খুলে অনেকদিন আগেকার দৈনিক পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগ থেকে একটা লাল হয়ে যাওয়া কাগজের কাটিং বের করলেন। আমি দেখলাম, ঐ ফাইলে এই রকম আরো পুরনো কাগজ

কিংবা পত্রিকা থেকে কেটে রাখা ছোট-বড় অনেক কাটিং রয়েছে।

কাটিংটা হাতে নিয়ে দেখতে দেখতে আমি বোকা বনে গেলাম। কিছুই নয়, খুব নির্দোষ একটা ব্যাপার—রন্ধন প্রণালীর ভিতরে বেগুনের হালুয়া বানাবার প্রক্রিয়া জানিয়েছেন কে এক হিঙ্গলা রায়। সেই হিঙ্গলা রায়ের রায়ের নির্দেশিত প্রণালী অনুযায়ীই তাহলে এই রান্না হয়েছিলো?

ভাবতে গিয়ে আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেলো, হাত-পা একটু একটু কাঁপতে লাগলো। খুব ভয় পেলে আমার ডান ভুরুর উপরের দিকে তিন বিন্দু ঘাম জমা হয়। করুণা-পিসির দেয়ালে টাঙানো আয়নার দিকে তাকিয়ে গুনে দেখলাম স্পষ্ট তিন বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম বেশ ভয় পেয়ে গেছি।

কিন্তু এতো ভয় পাওয়ার কি আছে? আসলে যাকে লোকে আত্মবিশ্বাস বলে সেটার আমার একান্ত অভাব।

এইখানে প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো যে এই আমি, আমিই একদা হিঙ্গলা রায় ছিলাম।

কি করে কবে যেন ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম, সবচেয়ে সহজে কাগজে লেখা ছাপানো যায় ঐ রন্ধনপ্রণালী বিভাগে, আর তার জন্যে কিছু পারিশ্রমিকও প্রাপ্য। কিছুদিনের মধ্যেই দৈনিক পত্রিকাগুলির পাতায় হিঙ্গলা রায়ের আবির্ভাব ঘটেছিলো। বড় পরিশ্রম করতে হতো বলে অবশেষে রন্ধন-প্রণালী লেখা ছেড়ে দিলাম। আর কি এক অজ্ঞাত কারণে সব কাগজ থেকে ঐ বিভাগটা প্রায় উঠেই গেলো।

একটু অভিনব ধরনের রান্নার পরামর্শ দিতেন বলে হিঙ্গলা রায় অতি অল্পদিনেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। কলার

খোসা, বেগুনের বোঁটা, ডাঁটার শিকড় ইত্যাদি পরিত্যাজ্য জিনিসগুলির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলাতেই ছিল হিঙ্গলা রায়ের বিশেষ কৃতিত্ব। তখনকার যে কোনো পাঠিকা (শুধু পাঠিকা কেন, রন্ধন-প্রণালীর নিশ্চয় কিছু পাঠকও ছিলেন,) একথা অম্লান বদনে স্বীকার করতেন। যেমন নমুনা দিচ্ছি —

কিছু কলার খোলা কুচি কুচি করে কেটে খুব ভালো করে করে জলে সেদ্ধ করুন। সেদ্ধ করার আগে জলে সামান্য নুন দিয়ে নেবেন, এতে কলার খোলার লৌহভাবটা দূর হয়ে যাবে। কি করে এসব উদ্ভাবনী শক্তি আমারই সামান্য মস্তিষ্কে তড়িৎ-প্রবাহের মতো খেলতো এখন যেন নিজেরই বিশ্বাস হয় না। ঐ লৌহভাব ব্যাপারটা কি, কলার খোসার সঙ্গে লৌহভাবের সম্পর্কই বা কি, আর যদি কোনো সম্পর্কই থাকে সামান্য নুনে সেটা দূরীভূত হবে ; নুন, লোহা, কলার খোসা সামান্য তিন লাইনের মধ্যে এতগুলো ব্যাপার ? সাবাস্ স্বর্গীয়া হিঙ্গলা রায়।

এর পরে আরো মারাত্মক। এইবার সেদ্ধ কলার খোসা-গুলো ভালো করে রোদে শুকিয়ে নিন। দেখবেন একটু স্যাঁতস্যাঁতে ভাবটা যেন থাকে, তাছাড়া স্নেহপদার্থটা একদম নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ স্যাঁতস্যাঁতে খোসাগুলো কিসমিস, তেজপাতা দিয়ে অল্প ঘিয়ে লালচে করে ভাজুন, তারপর চিনির আঁশ করে গজার মত তৈরী করে রাখুন। গরম গরম খাবেন। কৌটোয় তুলে রাখুন বাড়িতে অতিথি এলে তাদের এই কলার খোসার গজা দিয়ে আপ্যায়ন করুন।

আজ করুণাপিসির এখানে এসে সেই বেগুনের বোঁটার হালুয়া আমাকে নিজে খেয়ে যেতে হলো। একেই বোধহয় ভাগ্য বলে, নিয়তি কি এরই নাম ? হিঙ্গলা রায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইভাবেই আজ আমাকে করতে হলো।

তবে বেগুনের বোঁটার হালুয়া ব্যাপারটা শুনতে যে রকম

মারাত্মক মনে হচ্ছে, আসলে সেরকম বিশেষ কিছু নয়। বেগুনের বোঁটাগুলো তরকারি কুটবার পর ফেলে দেবেন না, আলাদা করে রেখে দিন। ঐ দিয়ে সামান্য খরচে অতি সহজে অতিথি-অভ্যাগত, আত্মীয়-কুটুম্বের আপ্যায়ন করতে পারবেন। বিয়েবাড়ীতে যদি আধমন বেগুন দিয়ে তরকারি বা ভাজা হয় তবে ঐ আধমন বেগুনের বোঁটা দিয়ে কত সুলভে সমস্ত অতিথির জন্য দুবেলার জলখাবার তৈরী করা যেতে পারে। অন্য সময়েও প্রয়োজনবোধে যে কোনো প্রতিবেশীর কাছ থেকে তাঁদের ফেলে দেওয়া বোঁটাগুলো সংগ্রহ করতে পারেন, এতে চক্ষুলজ্জার কিছু নেই, পরে তাঁদের প্রয়োজনে এই একইভাবে তাঁদেরও আপনি সাহায্য করতে পারেন।

বোঁটাগুলি ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে নিন, তারপর প্রত্যেকটিতে খুব সূক্ষ্ম করে চারটি করে ফালি করুন। চারটির বেশি ফালি করতে পারলে আরো ভালো, যত চিকন হবে ততই সুস্বাদু হবে হালুয়া। তবে এর জন্যে খুব ধারালো বঁটি প্রয়োজন। যাঁরা খুবই সূক্ষ্ম এবং সুরুচিসম্পন্ন রন্ধনে উৎসাহী, তাঁরা তরকারির ঝুড়ির মধ্যে এক শিশি ডেটল বা আয়োডিন রাখবেন। (এই ধরনের বাস্তব পরামর্শের জন্যেই হিঙ্গলা রায় খুব বেশি বিখ্যাত হয়েছিলেন।)

এইবার পরিমাণ মত দুধ নিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিন, দুধ যখন টগবগ করে ফুটবে একটা একটা আলাদা করে ফালি করা বেগুনের বোঁটা ছেড়ে দিন, খুব ধীরে ধীরে ছাড়বেন, দেখবেন, ফালিগুলো যেন জড়িয়ে না যায়। এরপর দুধটা বেশ ভালো করে জ্বাল দিয়ে নামিয়ে ঠাণ্ডা করে ছাঁকুন। খুব মিহি আদ্দি বা রেশম জাতীয় কাপড় ব্যবহার করবেন, বাজারের চায়ের ছাঁকনি ব্যবহার না করাই ভালো। ছেঁকে যে জিনিসটা পাওয়া গেলো সেটা শিল-নোড়ায় খুব মিহি করে বাটবেন তারপর উনুনে

অল্প আঁচে ঝরঝরে করে নেবেন। এইবার বেগুনের বোঁটার সুজি তৈরী হলো। এরপর যেভাবে আটার সুজি দিয়ে হালুয়া তৈরী করা হয় (কিভাবে তৈরী করা হয় ? হিঙ্গলা রায় কি জানতো ? নক্ষত্র রায় অন্ততঃ জানে না।) সেইভাবে হালুয়া তৈরী করুন। গরম গরম অতিথিদের খেতে দিন।

ব্যাপারটা মোটেই রহস্যময় নয়। কিন্তু সত্যিই আমার নিজের উপর আস্থা খুব কম, যেটুকু ছিলো তাও ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছি। তা না হলে আজ করুণাপিসির এখানে নিজের উদ্ভাবিত রান্না খেয়ে আহ্লাদিত হয়ে কোথায় বেশ গর্বিত হবো, তা নয় আমি ভীতিবিহ্বল হয়ে গেলাম।

মিসেস হালদারের কুকুর

মিসেস নবরূপা হালদারের বাড়িতে অনেককেই অনেক প্রয়োজনে যেতে হয়, কেউ যান কবিতার বইয়ের জন্য সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে, কেউ চাকরীর উমেদারিতে আর কেউ-বা গভীরতর কোনো প্রয়োজনে। আমাকেও যেতে হয়েছিলো, গিয়েছিলাম। ঠিক বিশেষ কোনো প্রয়োজনে নয়, চায়ের নিমন্ত্রণে।

আমার ধারণা হয়েছিলো মিসেস হালদার সম্ভবত আমাকে ছাড়াও আরো কাউকে কাউকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সাধারণত এই রকম ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশিষ্ট ব্যক্তির ওখানে নিমন্ত্রণ থাকলে আমি নির্দিষ্ট গৃহের কাছাকাছি পদ-চারণা করতে থাকি যতক্ষণ না পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তখন যূথবদ্ধ হয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে প্রবেশ করি।

আজ কিন্তু মিসেস হালদারের বাড়ির সামনের ফুটপাথে বহুক্ষণ পায়চারি করেও কোনো লাভ হলো না, আর যাদের নিমন্ত্রণ আছে যদি অবশ্য তেমন সৌভাগ্য আর কারো হয়ে থাকে তারা হয় আগে এসে গেছে, না হয় আসবে না। ঘড়ি দেখলাম সন্ধ্যা সাতটায় আসার কথা, এখন সাতটা বেজে দশ

মিনিট হতে চললো, এর চেয়ে বেশি দেরি করা অভদ্রত হবে।

গুটি গুটি বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম। মিসেস হালদার যতটা খ্যাতিমতী ততটা বিত্তশালী নন। কলকাতার উপকণ্ঠে ছোট একতলা বাড়ি। গেটে দারোয়ান বা পাহারোলা বলতে কিছু নেই। ঠিক গেটও নয় বাইরের ঘর আর রাস্তার মধ্যে হাত-চারেক জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা. নিঃসঙ্কোচেই এবং নির্ভয়েই ঐ চারহাত ভূমি অতিক্রম করেছিলাম. হঠাৎ বাইরের ঘরের দরজার ওপরে নজর এলো একটি বহুপরিচিত ঘোষণা, ঠিক কলিংবেলের বোতামের নিচেই।

বাঙলা, ইংরেজি, হিন্দী তিন ভাষায় লেখা,

'কুকুর হইতে সাবধান'
'Beware of dog'

এবং হিন্দীতে 'হুঁশিয়ার কুত্তা হ্যায়' সাইন বোর্ড লাগানো, পাশে বোধহয় নিরক্ষরদের সুবিধার্থেই একটি অতি হিংস্র কুকুরের ছবি আঁকা, আমি অবশ্য লিখতে-পড়তে একেবারে জানি না তা নয়, কিন্তু লিখিত অনুশাসনের চেয়ে চিত্রিত ভয়াবহতাই আমার পক্ষে মারাত্মক।

আমি যে খুব অপছন্দ করি কুকুর ব্যাপারটা তা ঠিক নয়, আমার নিজের বাড়িতেই ঘরে এবং বাইরে কয়েকটি কুকুর বিদ্যমান কিন্তু অচেনা এবং পাজি কুকুরকে আমি আজো খুবই ভয় করি। তারাও কেন যেন আমাকে দেখলেই ক্ষেপে যায়।

অতি শৈশবকালে দুটো নেড়ি কুকুর ভীষণ কলহ করে আমার অতি প্রিয় একটা এক নম্বর ফুটবল ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিলো, তারো কিছুকাল পরে আমাদের পাঠশালার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রবল মহিমান্বিত অশ্বিনী-

মাস্টারকে যখন কুকুরে কামড়িয়ে একমাস শয্যাশায়ী করে রেখেছিলো, তখন থেকেই কুকুরের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সচেতন। লোকে কোথাও বাড়ি ভাড়া করতে গেলে বা রাত্রি বাস করতে গেলে প্রশ্ন করে, 'ওখানে মশা কি রকম ?' আমি প্রশ্ন করি, 'ওখানে কুকুর কি রকম ?'

তবু যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। আর আমার জীবনে যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানেই বাঘের ভয়। যত কুকুরের হাতের (অর্থাৎ সামনের দুটো পা) থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছি তত বেশি করে কুকুরের পাল্লায় পড়েছি। মাস-তিনেক আগে একটা আনুমানিক যোগ করে দেখেছি যে আমি জীবনে সাতাশি মাইল রাস্তা কুকুরের তাড়া খেয়ে দৌড়েছি। এই সাতাশি মাইলের মধ্যে অর্ধেকের বেশি কাঁচা রাস্তা, ঝোপঝাড়, কাঁটা জঙ্গল, একবার দুই দিকের তারকাঁটার বেড়ার মধ্যে এক ফুট স্পেসে ছুটেছিলাম প্রায় আধ মাইল। পিচের রাস্তা বা ভালো বাঁধানো রাস্তায় দৌড়ানোর সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছে। কুকুরের তাড়াও এক ভিসাস্ সার্কল— যাকে বলে বিষাক্ত বৃত্ত। দৌড়লেই কুকুর তাড়া করবে আর তাড়া যদি করে কুকুর তাহলে দৌড়তেই হবে। তার মানেই পথের চারপাশের আর দশটি কুকুরকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা।

জীবনে আমি একশো দশ ঘণ্টা পানাপুকুরে ডোবার মধ্যে কাটিয়েছি কুকুরের তাড়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার অভিজ্ঞতা এই রকম যে সাধারণত পৌনে চার ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা ডোবার পাড়ে বৃথা পরিশ্রম না করে আক্রমণকারী কুকুর সরে যায়, তারো অর্ধঘণ্টাখানেক পরে নিঃশব্দে ডোবা বা পুকুর পরিত্যাগ করতে পারলে পুনরায় কোন দুর্ঘটনার ভয় থাকে না।

গাছে উঠতে পারলে অবশ্য সবচেয়ে সুবিধে হয়। যে কোনো কারণেই হোক কুকুরেরা গাছের নিচে এক ঘণ্টার বেশি অপেক্ষা করে না। কিন্তু হাতের কাছে, নাগালের মধ্যে গাছ পাওয়া যায় না সব সময়। আর সব সময় ওঠাও যায় না। তবে বিপদের সময় আরোহণ বা পরবর্তী অবতরণেও অসুবিধা বা অসম্ভাব্যতার কথা কে আর বিবেচনা করে। একবার এক ক্ষীণ টগর ফুলগাছে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে আমি ডাল ভেঙ্গে আক্রমণকারী কুকুরের পিঠে পড়ে যাই। ঐ একবার ছাড়া আর কখনো কোনো কুকুরকে জব্দ করতে পারিনি। অমন সন্ত্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করতে করতে যে এক মিনিট আগের ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন অন্তর্হিত হতে পারে সে আমার কল্পনারও অতীত।

কুকুরের আক্রমণে সবসুদ্ধ গাছে কাটিয়েছি ত্রিশ ঘণ্টা। অপরিচিত-পরিচিত গৃহের ভিতরে বা ছাদে উঠে গেছি অসংখ্য বার। রাস্তার ধারে পার্ক-করানো গাড়ির ছাদে দুবার, একবার এক আইসক্রিমওয়ালার বাক্সের ওপরে। তাও তার ওপরে দাঁড়ানো খুব কঠিন, খুব ব্যালান্স দরকার। আর ঐ অবস্থায় বিহ্বল আইসক্রিমওয়ালার প্রতিবাদ আর মারমুখী কুকুরের থাবা, ঐ অবস্থায় ব্যালান্স।

আজ মিসেস হালদারের বাড়িতে কলিং বেল টিপতে গিয়ে বুক কেঁপে উঠলো, কত ভীষণ কথা মনে পড়লো, 'কুকুর হইতে সাবধান' সব বীভৎস স্মৃতি মনের মধ্যে তাড়া করে এলো।

কবে কুকুর তাড়া করে বেড়া টপকিয়ে লেডিস পার্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো, কবে দৌড়ে পালাতে গিয়ে কর্পোরেশন অফিসে ঢুকে পড়ে বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কালাজ্বরের টিকা নিতে হয়েছিলো, আরো সেই কবে, সেই বুক-টনটন-করা দুঃসহ সন্ধ্যা যেদিন কাণ্ডজ্ঞানহীন অবস্থায় প্রিয়তমা

সংযুক্তাকে ল্যান্সডাউন রোডে একটি খেঁকিকুকুরের সম্মুখে পরিত্যাগ করে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়নপর হয়েছিলাম।

প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন কুকুর আমাকে এত তাড়া করে? সে কি আমার অভূতপূর্ব চেহারার জন্য, নাকি হাঁটার সময় আমার বাঁ পা যে ৪৫ ডিগ্রী কোণ করে ঘুরে যায় সেই বৈচিত্র্যের জন্য? যার জন্যেই হোক না কেন, এখন আমি কি করবো?

চারিদিকে সন্তর্পণে তাকাতে থাকি, না বেড়ার থেকে দরজার মধ্যে কোনো কুকুর নেই, কুকুর বাড়ির মধ্যেই। তাহলে কি বাড়ির মধ্যে ঢোকার জন্যে বেল দেবো, অবশ্য আমি অপ্রার্থিত বা অবাঞ্ছিত নই। গৃহকর্ত্রীর উচিত তাঁর হিংস্র কুকুরকে শৃঙ্খলিত করে রাখা। কিন্তু অনেক, সময় অনেক সময় মানে অধিকাংশ সময়েই এর উল্টোটা ঘটে থাকে, অন্তত আমার এই অভিজ্ঞতা।

দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় কিছুক্ষণ ইতিউতি করলাম। তারপর মরিয়া হয়েই যেন, যেভাবে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে ঢুকে যাই, সেভাবেই কলিংবেল টিপলাম।

একটু পরে একটি বালক-ভৃত্য বেরিয়ে এলো। তাকে কিছু বোঝানোর আগেই মিসেস হালদারের দেখা পেলাম। তিনি হাসি মুখে এগিয়ে এলেন, 'আসুন।' তারপর একটু থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, 'আগে একটু দাঁড়ান।' তারপর বালক-ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ লছমন, টাইগার কাঁহাপর হ্যায়?'

বুঝতে পারলাম বহির্দ্বারে অঙ্কিত বীভৎস সারমেয়টিরই নাম 'টাইগার'। হাঁটু কাঁপতে লাগলো। হাঁটু কাঁপা বেড়ে গেলো যখন লছমন এসে জানালো টাইগার কোথায় লুকিয়েছে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। টাইগার কত বড়, কি আয়তনের কে জানে বাবা, কিন্তু এইটুকু একটা

একতলা বাড়িতে একটা কুকুর কোথায় লুকোতে পারে ? নিশ্চয় লছমন ভালো করে খোঁজেনি, এই ছোকরাগুলো যা ফাঁকিবাজ হয়।

মিসেস হালদার আমাকে বললেন, 'দেখছেন কাণ্ডটা! তা আপনি কুকুর দেখে ভয় পান না তো? অবশ্য আপনার লেখা পড়লে খুব ভীতু।বলেই মনে হয়।'

ভীতু কি সাহসী জানি না, আমি চিরদিনের পলাতক। আজ কি হলো জানি, না বলে বসলাম, 'না কুকুরকে আর ভয় কি?'

'অত সাহসেরও কিছু নেই।' মিসেস হালদার জানালেন, 'আর তাছাড়া টাইগার যা রাগী আর বদমায়েস। আপনি একটু সাবধানে আসুন। আমি কাছে রয়েছি, ভয়ের কিছু নেই।'

কম্পিত কণ্ঠস্বরে, 'ভয় কি ভয় কি' করতে করতে আমি বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম।

সাহিত্য রাজনীতি ইত্যাদি খুচরো ব্যাপার-বিষয় নিয়ে দু-একটা কথাবার্তা হলো। এরই মধ্যে মিসেস হালদার একাধিকবার বললেন, যদি টাইগার এসে পড়ে আমি যেন দৌড়াদৌড়ি না করি ভয়টয় পেয়ে। ভয়ের কোনো কারণই নেই। আর তাছাড়া তিনি তো পাশে রয়েছেন।

ভয়ে ভয়ে আমি যত সিনেমা, সাহিত্য, সুচারুশিল্পের দিকে আলোচনা নিয়ে যেতে চাই তিনি ততো টাইগারের বীরত্বের গল্প করেন। কবে টাইগার ডাকপিয়নকে তাড়া করে গিয়েছিলো, ছাদে পায়রা ধরতে গিয়ে লাফ দিয়ে একতলায় পড়ে গিয়েছিলো।

কথায় কথায় সময় যায়, চা আসে না, আমিও উঠতে পারি

না। অত উৎকণ্ঠিত অবস্থায় সময়যাপন বোধহয় বিয়ের রাত্রিতেও আমাকে করতে হয়নি।

অবশেষে চা এলো। এক দরজা দিয়ে লছমন চায়ের পেয়ালা আর খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকলো আর অন্য দরজা দিয়ে টাইগার। মিসেস হালদার লাফিয়ে উঠলেন, 'এই সেরেছে! দেখবেন, ভয়ের কিছু নেই।' এই বলে লছমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ উল্লুক, ক্যা দেখতা, যাও জলদি করকে চেন লে আও।'

লছমন দৌড়ে গিয়ে চেন নিয়ে এলো। গৃহকর্তা মিঃ হালদার শুনেছি ডকে না জেটিতে কোথায়, কাজ করেন। বোধহয় জাহাজ বাঁধবারই হবে একটা ভারি লোহার শিকল খুব কষ্ট করে লছমন বয়ে নিয়ে এলো।

এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে টাইগার দরজার চৌকাঠের ওপরে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলো আমাকে, শিকল দেখেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু পালাবে কোথায়, লছমন ধরে গলায় চেন পরিয়ে দিলো। অতি নির্জীব, ইঞ্চিছয়েক লম্বা আধমরা বাচ্চা একটা দিশী কুকুর। গলায় চেন পরাতে মেঝেতে এলিয়ে কাত হয়ে পড়ে গেলো দুর্দান্ত টাইগার।

জীবনে এই প্রথম আমি কুকুর দেখে ভয় পেলাম না।
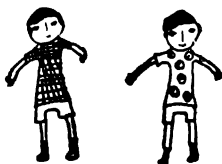
গর্জন গোয়েন্দা

'লেগস্ আপ। সামনের দুটো পা মাথার ওপরে তুলুন মিঃ রাইট।' বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ঠগ মিঃ রাইট অবাক হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কী হাস্যকর, এই রোগা বেঁটে লোকটা, এই বোকাবোকা চেহারার বদমাইশটা! বদমাইশটাকে দেখে রাইটের সারা শরীর তেলে-বেগুনে জ্বলে গেলো। রাইট নিজেই বুঝতে পারলেন না কী করে এই বোকা বদমাইশটার কাছে এত বেকায়দায় পড়লেন তিনি। এখন আর করার কিছু নেই। হাত দুটো মাথার ওপরে তুলতেই হবে, কেননা সামনে উদ্যত রিভলবার যে হাস্যকর বোকা বদমাইশটা দাঁড়িয়ে, সে-ই গর্জন গোয়েন্দা। তার হাত থেকে নিস্তার পাবে এমন সাধ্য নেই কোনো জোচ্চোরের।

রাইট হাত তুলতে একটু ইতস্তত করছিলেন। আবার শোনা গেলো গর্জনের বজ্রগর্জন, 'লেগস্ আপ। সামনের পা দুটি তুলুন।'

কী আর করা যাবে, বাধ্য হয়ে হাত তুলতে হলো। মনে মনে ক্ষিপ্ত হতে থাকেন বিখ্যাত ঠগ। এই ধরনের কথাবার্তা বা আদেশ তাঁর পক্ষে পালন করা মোটেই সম্মানজনক নয়।

'লেগস্ আপ, সামনের দুটো পা! আমি কী গোরু না গাধা? আমার এ-দুটো পা নয়, হাত।' আত্মসম্মান রক্ষার প্রয়োজন থেকেই বা সাহেবের বাচ্চা বলে স্পষ্টবাদিতার গুণের জন্যে হাত মাথার ওপরে তুলতে তুলতে রাইট গর্জনকে জানিয়ে দেন।

গর্জন কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করেন না। 'ও তাই নাকি, তাই নাকি', একটু অবাকই হন গর্জন, 'কেন আগে তো বুঝিনি। আমি ভেবেছিলুম চারটিই বুঝি পা।' তারপর একটু থেকে মৃদু হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেন, 'তাহলে বোধহয় ল্যাজ, শিং-টিংও তোমার কিছু নেই?'

কলকাতায় এলে এই রকম অপমান এই রকম বিপদের সম্ভাবনা একথা ঘুণাক্ষরেও জানতে বা বুঝতে পারলে রাইট কখনোই কুয়ালালামপুর ছাড়তেন না। কুয়ালালামপুরে অবশ্য শেষের দিকে বেশ একটু অসুবিধাই হয়েছিলো। ওখান-কার স্থানীয় চোরদের ওপর 'তিনি' সম্প্রতি যে বাটপাড়িটা করছিলেন, অর্থাৎ বিনা অস্ত্রে তালা ভাঙার কৌশলী যন্ত্র নাম দিয়ে যে জিনিসটা বেচছিলেন, সেটা যে আসলে যুদ্ধের আগের এক ধরনের জাপানী ইঁদুর মারার জাঁতিকল পুরোনো লোহার দরে একটা উঠে যাওয়া কোম্পানির দারোয়ানের কাছ থেকে কিনে এনেছিলেন টোকিয়ো থেকে চলে আসার সময়। সেই জাঁতিকলগুলিই কুয়ালালামপুরের নতুন চোরেরা মহোৎসাহে ক্রয় করেছিলো, কিন্তু কুয়ালালামপুর ছাড়বার আগেই কয়েকটা চ্যাংড়া চোর ধরা পড়ে যাওয়ায় অন্যান্য চোরেরা তাঁকে মারে আর কি! সিঁদেলরা আর কী বুঝবে বাটপাড়ের মর্ম? বাধ্য হয়েই তাঁকে কুয়ালালামপুর ছাড়তে হতো। অবশ্য শেষে একটা চাল দিয়েছিলেন এই বলে যে এই তালা ভাঙার যন্ত্রগুলো ব্যবহার করতে গেলে এক ধরনের চুম্বক লাগবে, সেই চুম্বকটা কেউ ব্যবহার করেনি বলে বিপদে

পড়েছে। চোরেরা ধরেছিলো, 'কেন তুমি তাহলে চুম্বকটা সঙ্গে দাও নি?'

মিঃ রাইট বলেছিলেন, 'তোমরা কি কেউ চেয়েছিলে? তার যে অনেক দাম,' আর মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলেন এই সুযোগে সেই বিশেষ চুম্বক বলে অন্য কিছু চালিয়ে দিয়ে একটা মোটা মতন দাঁও মেরে ওখান থেকে সরে পড়বেন। চোরেদের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছিলো, ছয় মাসের মধ্যে সস্তায় তিনি এই চুম্বকগুলো সরবরাহ করবেন।

এদিকে মিঃ রাইটও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। চোরদের সঙ্গে কি ব্যবসা হয়! তিনি হলেন বাটপাড়, তাঁর ব্যবসা ভদ্রলোকেদের সঙ্গে! লণ্ডনে যুদ্ধের সময়ে তিনি 'বোমার আঘাতজনিত দূষিত ক্ষয় নিবারণের জন্য এবং আশু উপশম করবার মলম' তৈরী করে বেচেছিলেন স্রেফ তার্পিন তেলে আলুর খোসা সেদ্ধ করে শিশিতে ভরে দেড় মিলিয়ন শিশি। কুয়ালালামপুরের চোরেদের ব্যবহারে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ খুব আহত হয়েছিলো।

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। হাত দুটো মাথার ওপরে তুলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কী যে কষ্টকর। যাকে এ-কাজ কখনোই করতে হয়নি, তার পক্ষে এটা বোঝা সম্ভবই নয়। মিঃ রাইট এইভাবে দাঁড়িয়ে মনে মনে রাগতে থাকেন। না, ঠিক গর্জন গোয়েন্দার উপরে নয়। আর তার উপরে রাগ করে লাভই বা কী? রাইটের রাগ হয় ওয়াং লিয়াং চু-র উপর।

ওয়াং লিয়াং চু, মানে কুয়ালালামপুরের এক কুখ্যাত জুয়া-চোর, যে তাঁকে এই কলকাতা আসবার পরামর্শ দিয়েছিলো। ওয়াং লিয়াং চু-কে কুয়ালালামপুরে সবাই জোচ্চোর চু বলে এক নামে চিনতে পারতো। সেই রাইটকে বলেছিলো, 'আরে সাহেব, আমিই পারলুম না আর তুমি করবে বাটপাড়ি এই

কুয়ালালামপুরে! সিঁদেল চোরদের হাতে খুন না হতে চাও তো, সত্যি সত্যি নিজের ভালো চাও তো, পালাও এখান থেকে।'

রাইটের মুখের ভাবগতিকে জোচ্চোর চু বুঝতে পেরেছিলো রাইট মনস্থির করতে পারছেন না। তখন সে, হয়তো নিজের স্বার্থেই কুয়ালালামপুর থেকে রাইটকে কৌশলে সরিয়ে নিজে একচ্ছত্র বাটপাড় হওয়ার লোভেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রায় গায়ে পড়ে রাইটকে পরামর্শ দিলো, 'সাহেব, তুমি কলকাতায় ভেগে যাও।'

'কলকাতা? ক্যালকাটা?' ক্যালকাটা সম্পর্কে রাইটের প্রশ্নেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিলো।

'ইয়েস সাহেব, ক্যালকাটা, একেবারে হেভেন, ইডেন গার্ডেন। রাস্তাঘাটে লোকজন ঠকবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' আসন্ন সাফল্যের উত্তেজনায় ওয়াং লিয়াং চু যথেষ্ট রঞ্জিত করে বর্ণনা করে তার নিজের প্রাক্তন সাফল্যের কথা। 'আমার জুতোর দোকান ছিলো চীনেপাড়ায়। এক এক জোড়া কাঁচা চামড়ার জুতোয় লাভ হতো দশ টাকা। আর খদ্দের কালার ব্লাইণ্ড মানে রঙকানা হলে পনেরো টাকা।'

'রঙকানা হলে পাঁচ টাকা বেশি কেন?' বেশ অবাক হয়েই রাইট প্রশ্ন করেছিলেন।

'দু-রঙের দু-পাটি দিতুম বাক্সে। তার আগে কয়েক রঙের জুতো কালো, কালো, বাদামি, লাল মিশিয়ে যাচাই করে নিতুম খদ্দের রঙকানা কি না। তা কলকাতার অর্ধেক লোকেরই চোখ খারাপ! তাতে রঙকানা, ভেজাল ছাড়া আর কিছু খেতে পায় না তো।' একটু দম নিয়ে জোচ্চোর চু বলে যায়, 'তারপর সেই জুতো পাল্টাতে এলেই বাছাধনের কান মলে আদায় করে নিতাম আরও পাঁচ টাকা। প্রথমে স্বীকারই করতাম না যে জুতো

জোড়া আমারই দোকানের। আর তা ছাড়া প্রত্যেক জোড়া জুতোর সঙ্গে উপরি পাওনা ছিলো পাঁচ টাকা 'ফোড়া কাটার জন্যে। এছাড়া ছিলো ফোস্কার মলম। নাম দিয়েছিলাম "মু-চুম"—প্রত্যেক ফাইল দেড় টাকা।'

রাইট একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, ফোড়া, ফোসকা এগুলো আবার জুতোর দোকানে কেন?'

জোচ্চোর চু বলেছিলো, 'আরে সাহেব, ঐ তো হলো সাইড বিজনেস! কাঁচা চামড়ার জুতো পায়ে দিলে ফোড়া হবে না লোকের, ফোসকা পড়বে না? কলকাতায় গেলে দেখবে প্রত্যেক চীনে জুতোর দোকানের সঙ্গে একটা করে ফোড়া-ফোসকা সারানোর দোকান। সাইনবোর্ড টাঙানো আছে, "চীনা সার্জন"। এক জোড়া জুতো সেলাই করার চেয়ে অনেক কম পরিশ্রমে ফোড়া কেটে পাঁচ টাকা পাওয়া যেতো—অনেক খদ্দেরের পায়ে আবার ফোড়ার মিছিল বসে যেতো। সে সব কথা না হয় ছেড়েই দিলে।'

কিন্তু এত সহজে চু-কে ছাড়েন রাইট? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করে, অনেক জেনেশুনে তবে ছেড়েছিলেন। আর তার পরের জাহাজেই ভুয়া পাসপোর্টে চলে এসেছিলেন কোচিন। তারপর কোচিন থেকে সোজা কলকাতা।

কলকাতায় এসে মিঃ রাইট দু-চার দিন ঘুরে ফিরে সব দেখে শুনে নিজের কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন। একটা প্রাইভেট গাড়ি তিন মাসের জন্য ভাড়া নিয়ে নিলেন, তারপর এক একটা হোটেলে দু-দিন তিনদিন করে থাকতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে কাজ গুছিয়ে নিতে লাগলেন নিজের।

দুপুরের দিকে চৌরঙ্গী আর ডালহৌসী পাড়ায় যতো সব বড়ো বড়ো রেডিয়ো, ফ্রিজের দোকান আছে সেখানে গিয়ে সবচেয়ে দামী জিনিসটা দেখতেন। এই রকম ভাবে তিন চারটে

জিনিস বেছে নিয়ে আলাদা করে রেখে দিয়ে বলতেন,—'এগুলোর একটা আমি বেছে নেবো কিন্তু তার আগে আমার মেমসাহেবকে একবার দেখানো দরকার।'

দোকানদার কিছু ইতস্তত অবশ্যই করতো, কিন্তু ফিটফাট সাহেব, চোস্ত ইংরেজি, আর তা ছাড়া রাইটই বলতেন, 'আপনার একজন কর্মচারী আমার সঙ্গে গাড়িতে এগুলো নিয়ে আসুক। যেটা মেমসাহেবের পছন্দ হয় রেখে দেবো, অন্যগুলো ফেরত নিয়ে আসবে। ঐ আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে মাল কটা তুলে দিন।'

এর পরে কি আর কোনো সন্দেহ হয়? কোনো আপত্তি থাকতে পারে? আর সঙ্গে তো দোকানের বিশ্বস্ত কর্মচারীই আছে। তাছাড়া, এই রকম একটা শ্বেতাঙ্গ খদ্দের, আমি বিশ্বাস না করলেও আর দশজন দোকানদার আছে তারা নিশ্চয়ই দেবে, তখন তাদেরটাই বিক্রি হবে।

সুতরাং সব দোকানদারই মুখে যথাসাধ্য হাসি ফুটিয়ে বলেছে, 'ইয়েস সার। ঠিক হ্যায় সার, এই এখুনি তুলে দিচ্ছি এগুলো আপনার গাড়িতে।' তারপরেই তারা হাঁকডাক শুরু করে দেয়, 'এই জনার্দন, এগুলো ঐ গাড়িটাতে তুলে দে। এই সাবধান, দেখিস ভাঙে না যেন। আর হ্যাঁ, গোপালবাবু আপনি সাহেবের সঙ্গে যান। মেমসাহেবকে খুব ভালো করে চালিয়ে একেবারে যাকে বলে স্যাটিসফাই করে তারপরে আসবেন।'

ততক্ষণে রাইট দোকানদারের দিকে মুখ করে বলেছেন, 'ক্যাশ, না চেক?' এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের উত্তরের অবকাশ না দিয়েই বলেছেন, 'বুঝেছি, চেকে অসুবিধা হতে পারে। আপনাদের এই ক্যালকাটায় কেউ চেক অ্যাকসেপ্ট করতেই চায় না। ঠিক আছে ক্যাশেই দিয়ে দেবো।' তারপর গাড়ির দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করেছেন, 'হ্যাঁ, আপনার সেলসম্যান যে

সঙ্গে যাচ্ছে, সব দাম ঠিকঠাক জানে তো?' দোকানের মালিক বলেছে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়। ওঁর, মানে ঐ গোপালবাবুর হাতেই টাকাটা দিয়ে দেবেন।'

এর পরের কাজ খুব সোজা। গড়ের মাঠে কিংবা গঙ্গার ধারে কিংবা আলিপুর রোডে একটা বেশ নির্জন জায়গা দেখে রাইট গাড়িটা থামিয়ে দিয়েছেন। নির্জন জায়গা খুঁজতেও খুব একটা বেগ পেতে হয় না। দুপুরের দিকে এ সব অঞ্চলে রাস্তায় কী-ই বা লোকজন থাকে? কিছুক্ষণ খট খট দুমদাম করে ইঞ্জিনটা খুলে নিয়ে রাইট গোপালবাবুর কাছ থেকে প্রথমে জেনে নিয়েছেন গাড়ির কিছু বোঝেন কি না। তারপর খুব মোলায়েমভাবে অনুরোধ করেছেন, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বোধহয় ঠেলতে পারলে একটু কাজ হতো। আমি স্টিয়ারিংটা ধরছি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো দয়া করে পিছনে গিয়ে ঠেলুন না গাড়িটা।'

সরলচিত্ত বিশ্বস্ত সেলসম্যান যেই না গাড়ির পিছনে গিয়ে হাত লাগিয়েছেন, হুস করে গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে গেছেন রাইট। প্রথমে গোপালবাবুর পক্ষে কিছু অনুমান করাই মুশকিল, 'ও সাহেব, থামাও, আমি রইলাম যে, আই অ্যাম লেফট হিয়ার, টেক মি!' কিছুক্ষণ হতভম্ভ থেকে তারপর গাড়ির পেছনে এই রকম চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছেন—কিন্তু ততক্ষণে রাইট বেপাত্তা।

উদীয়মান ডেন্টিস্ট ডঃ জি. কে. বসু তাঁর হাজরার চেম্বারে বসে গোপালবাবুর কাছে এই ঘটনা শুনছিলেন। ডঃ জি. কে. বসুর পুরো নাম গর্জনকুমার বসু। দাঁতের ডাক্তারির পশার এখনও মনোমতো জমেনি আর ছেলেবেলা থেকে গোয়েন্দা গল্প পড়ে পড়ে তিনি অবসর সময়ে শৌখিন গোয়েন্দাগিরি করে সময় কাটান।

যা হোক, গোপালবাবুর মুখে এই রকম শুনে গর্জন বললেন, 'কী সাংঘাতিক কথা!'

গোপালবাবু গর্জনের পিতৃবন্ধু, তিনি প্রায় কেঁদে পড়ে বললেন, 'ছাখো গর্জন, ব্যাটা বাটপাড় সাহেবের জন্যে আমার চাকরি যেতে বসেছে। ছাখো, আমার কী দোষ? আমাকেই তো মালিকেরা পাঠালেন। আমি তো আর ইচ্ছে করে যাই নি।'

গর্জন গম্ভীরভাবে বললেন, 'আপনি কিছু ভাববেন না গোপালকাকা, আমি ব্যাটাকে ধরে দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমাকে কয়েকটা ব্যাপার জানতে হবে। ঠিক আছে, আমি একটু ভেবে নিই, কাল আপনি সন্ধ্যার দিকে বাসায় থাকবেন।'

ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখে রবীন্দ্রনাথের 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' গানটা গর্জনের খুব ভালো লেগেছিলো। এতদিনে গানের কথাগুলো ভুলে গেছেন, কিন্তু সুরটা মনে আছে, সেই সুরে গর্জন এখন অন্য একটা গান ধরেন; ঠিক গান নয়, একটা সংস্কৃত শ্লোক :—

'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য···

···শশকেন নিপাতিত।'

গোপালকাকা চলে যাওয়ার পর গর্জন একা একা বসে এই গানটা গাইতে লাগলেন। তারপর গান হয়ে গেলে তাঁর ছোকরা অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে ডাকলেন, 'শশক, এক কাপ চা।' বলা বাহুল্য, গর্জন তাঁর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, যার আসল নাম গৌরগোবিন্দ, তাকে শশক বলে ডাকতেন।

চা-টা খেয়ে সব প্ল্যান ঠিক করে ফেললেন। একেবারে হাতে-নাতে ধরতে হবে সাহেবকে। এই জুয়াচোরগুলো ধরা পড়ে অতি লোভে, যে জুয়াচুরি সহজেই একবার করে আসা

যায় সেটা বারবার করার বাহাদুরিতে আর লোভে মারা পড়ে জুয়াচোরগুলো।

পরদিন গোপালকাকার সঙ্গে পরামর্শ করে চৌরঙ্গী পাড়াতেই অন্য একটা রেডিয়োর দোকানে মালিকদের বুঝিয়ে শুঝিয়ে দুপুরের দিকে সেলসম্যান হিসেবে বিনে মাইনের কাজে ঢুকে গেলেন গর্জন।

পরে সত্যিই একদিন ফাঁদে পা দিলেন রাইট। দোকানে পা দেওয়ামাত্র পুলিশে টেলিফোন করা যেতো, কিন্তু গর্জন সহজে পুলিশে যেতে রাজী নন, তাছাড়া হাতেনাতে ধরতে হবে তো। আগেই মালিকদের সব বোঝানো ছিলো, তাছাড়া ঝুঁকি হিসেবে ধারদেনা করে হাজার কয়েক টাকা নগদ জামিনও রেখেছিলেন গর্জন।

সুতরাং রাইটের কিছুই অসুবিধা হলো না। চারটে দামী রেডিয়ো সুদ্ধ দোকান থেকে গাড়িতে গিয়ে উঠতে, সঙ্গে গর্জন গোয়েন্দা উঠলেন সেলসম্যান হিসাবে—যিনি গিয়ে রাইটের কল্পিত মেমসাহেবকে রেডিয়ো পছন্দ করাবেন। গর্জন একেবারে নিরীহ চেহারার, রাইটের একেবারে সন্দেহ হয়নি।

তারপর গড়ের মাঠের মাঝামাঝি সেই একই নাটকের পুনরায় অভিনয় হলো। সেই গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়া, সেই খটখট দমাদম, তারপর অনুরোধ, 'যদি কিছু মনে না করেন গাড়িটা কি একটু ঠেলতে পারবেন।'

শুধু সামান্য পরিবর্তন, এবারে গোপালবাবুর স্থানে গর্জন গোয়েন্দা, পকেটে রিভলবারটা ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে, চাঁদের হাসির সুরে 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য' গুনগুন করতে করতে, 'ইয়েস ইয়েস' বলে গর্জন গাড়ি থেকে নেমে পিছনে চলে গেলেন ঠেলতে।

পিছনে গিয়ে রাইটের গাড়ি স্টার্ট নেবার এক মুহূর্ত

সুযোগ না দিয়ে হাওয়া ছেড়ে দিলেন দুটো টায়ারের। হাওয়া বেরিয়ে যাওয়ার শব্দে 'কী হলো, হোয়াটস দি ম্যাটার,' বলে রাইট লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন গাড়ির পিছনে। আর তখন সেখানে রিভলবার উঠিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গর্জন গোয়েন্দা; রাইট মুখোমুখি হতেই—'লেগস্ আপ। সামনের দুটো পা মাথার উপরে তুলুন মিঃ রাইট।'